শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যুগাচার্য্য—প্রভুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর
দিব্য জীবনালোকে
আচার্য্যানুশীলন

জগদ্‌গুরু-ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানুকম্পিত-

প্রিয়পার্ষদপ্রবর-
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজানুগৃহীত-

পরমপ্রেষ্ঠ-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্কর-
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বামন-গোস্বামি-মহারাজ-

অনুসৃত-ধারাবস্থিত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-পর্য্যটক-মহারাজ-
কর্ত্তৃক-সম্পাদিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

আদি-সংস্করণ—
৪ গোবিন্দ, ৫২৮ শ্রীগৌরাব্দ,
২৩ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ,
(৭।২।২০১৫)।

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঃ।
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**, চৌমাথা, চুঁচুঁড়া (হুগলী)।
৩। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, শক্তিগড় (জলপাইগুড়ি)পোঃ শিলিগুড়ি।
৪। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৫। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ**, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ**, স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।
৭। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।
৮। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
৯। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ**, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।
১০। **শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ**, ১/১ নিমাইতীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১১। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, রংপুর, শিলচর-৯, (কাছাড়) আসাম।
১২। **শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ**, পাণ্ডু, গৌহাটী-১২ (আসাম)।

মুদ্রণে—
শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা প্রেস
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

নিবেদন

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অশেষ অনুকম্পায় তাঁহার শুভাবির্ভাব তিথি-বাসরে তাঁহার হৃদয়াসীন দেবতা সম্বন্ধে ''**যুগাচার্য্য—প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর দিব্য জীবনালোকে আচার্য্যানুশীলন**'' এই গ্রন্থটী পুষ্পাঞ্জলি-রূপে প্রকাশিত হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দানুভব হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময়কালীন সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রে ৯ম খণ্ডে (২৮, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৪৪, ৪৫ ও ৪৮ সংখ্যায়) ''আচার্য্যানুশীলন'' নামক প্রবন্ধ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটী তত্ত্বসিদ্ধান্ত-পিপাসু ব্যক্তিগণের জন্য অমৃত-কূপ স্বরূপ। বিশেষতঃ ইহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অদ্বিতীয় অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য-চরিত্র যেরূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা সকল গৌড়ীয়াচার্য্যগণের জন্য আলোক-স্তম্ভ স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—যুগাচার্য্য। তাঁহার তুলনা স্বয়ং তিনিই। এই প্রবন্ধ-রত্নটী সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে ও সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে ইহাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল।

''**আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥**'' (বায়ুপুরাণ)—যিনি শাস্ত্রের গূঢ় সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক উহার তাৎপর্য্য জগতে প্রকাশ করেন এবং স্বয়ং উহার আচরণ সহকারে অপরকেও পরমার্থপর আচরণে স্থাপন করেন, তিনিই জগতে 'আচার্য্য' বলিয়া কথিত হন। ইহাই 'আচার্য্য'-পদের মুখ্যার্থ। শ্রীল প্রভুপাদ এই মুখ্যার্থেরই মূর্ত্তবিগ্রহ। ইতঃপূর্ব্বে কলির তাণ্ডবতায় উক্ত পদ কেবল উপাধি মাত্ররূপে বা কাক-পক্ষীর ময়ূরপুচ্ছ ধারণ-রূপে প্রযুক্ত মাত্র হইত—মুখ্যার্থের প্রকাশ অন্তর্হিত ছিল। যে-যুগে যুগাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া অনর্পিতচর ব্রজপ্রেম বিতরণ করিয়াছেন, সেই যুগে তাঁহার নিজজন ব্যতীত আর কে যুগাচার্য্য-রূপে 'আচার্য্য'-পদের মুখ্যার্থ জগতে প্রকাশ করিতে পারেন?

''পৃথিবীতে ধর্ম্ম নামে যত কথা চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।।'' এই ছল-ধর্ম্মই জগতে 'ধর্ম্ম' নামে বিকাইত। শতকরা প্রায় শতভাগ লোকই এই ধর্ম্মের গ্রাহক হইয়া ধার্ম্মিকাভিমান করিতেন। যে বা কেহ তন্মধ্যে শাস্ত্রতাৎপর্য্য অনুভব করিতেন, তাঁহারা সমাজ-চ্যুত, পিষ্ট, নির্য্যাতিত হইবার ভয়ে মৌনাবলম্বন করিতেন। 'যুগাবতারী' ভগবান্ যুগধর্ম্মকে এরূপ নিগৃহীত, লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া 'যুগাচার্য্য'কে জগতে প্রেরণ করিলেন। সেই যুগাচার্য্য-পাদ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দিব্য জীবনালোকেই বস্তুতঃ 'আচার্য্য' বলিতে কি বুঝায়, তাহা উপলব্ধ হয়। আচার্য্য-সান্নিধ্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অনাদিকাল ধরিয়া পুষিয়া রাখা ও ক্রম-বর্দ্ধমান অবিদ্যার স্তূপ বস্তুতঃ বিনষ্ট হয় না। 'ভক্তি'র নামে কত কত যে ভক্তি-বিপরীত বা ভক্তি-বিরোধী কথা আসিয়া শ্রীভক্তিমার্গকে কণ্টকিত করিয়াছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ বজ্র-নির্ঘোষ-কণ্ঠে ও অঙ্গুলী-দ্বারা এক এক করিয়া সর্ব্ব জগদ্বাসীর সমক্ষে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন এবং নিজ আচরণ-দ্বারা দেখাইয়াছেন—শাস্ত্র-বাণী কেবল মুখের কথা নহে, তাহা শতকরা শতভাগই নিজ জীবনে আচরণ করা সম্ভব, সম্ভব, সম্ভব। তাঁহার সেই সব অবিদ্যা-নাশিনী, তর্কানল-নির্ব্বাপণী, বীর্য্যবতী কথা সর্ব্বকালের জন্যই শুদ্ধভক্তি-পথের পথিকৃৎ হইয়া থাকিবে। সেই সারস্বত ও শাশ্বত বাণী মধ্যে যিনি যত প্রবিষ্ট হইবেন, শ্রীবাণী তাঁহাকে তত আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার মধ্যে 'আচার্য্য'ত্ব সঞ্চার করিবেন। তাহাতেই মাত্র শ্রীসারস্বত-ধারা অক্ষুণ্ণ রহিবে।

এই গ্রন্থপ্রকাশে 'আসাম'-প্রদেশের শিলচর-নিবাসী শ্রীযুক্তা নমিতা রায় অর্থানুকল্য করায় বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীকেশবাবির্ভাব-তিথিবাসর
৪ গোবিন্দ, ৫২৮ শ্রীগৌরাব্দ।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১। জীবন-তরণীর কর্ণধার-নির্ণয়ে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানের আবশ্যকতা	**১-৮**
ক) সমস্যা-সমাধান, না সমস্যা-শৃঙ্খল-সৃষ্টি	১
খ) সমস্যার জটিলতা-প্রসার	১
গ) জীবন-সমস্যাই বড় সমস্যা	২
ঘ) নিয়ামকের সমস্যা—সর্ব্ব-নিয়ামক-সমস্যা	২
ঙ) জাগতিক ও পারমার্থিক শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য	৩
চ) শ্রুতি-কথিত গুরু-নির্ব্বাচন-প্রণালী	৩
ছ) বর্ষ-পরীক্ষা	৪
জ) বর্ষ-পরীক্ষার পথ ও বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথ	৪
ঝ) বর্ষপরীক্ষার পথে সদ্গুরুসঙ্গে ক্রম-মঙ্গল	৪
ঞ) সত্যের আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় সত্যপথ কুহকাবৃত	৫
ট) অবৈধ-প্রতিযোগিতাময়ী ধর্ম্মোন্মত্ততা	৫
ঠ) বিচারে বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত নিরপেক্ষতা আবশ্যক	৬
ড) জগৎ ভগবদ্বহির্ম্মুখ গণসমষ্টির আগার	৭
ঢ) সত্য বিপ্লবী—বিদ্রোহী নহে	৭
ণ) অনুসরণ-পন্থা	৮
২। প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান জগৎ	**৯-১১**
ক) 'বর্ত্তমান জগৎ' কথার তাৎপর্য্য	৯
খ) জগজ্জীবের 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' নামক দুই মায়ামৃগের পশ্চাৎ ধাবমানতা	৯
গ) 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' লতা ব্রহ্মাণ্ড-বর্ত্তিনী, কিন্তু 'ভক্তি' লতা ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী	১০
ঘ) ভোগ-ত্যাগোন্মুখ বিশ্বে প্রভুপাদের সনাতন সত্য পুনঃস্থাপন	১১

৩। প্রভুপাদ ও যন্ত্রযুগ **১৩-১৪**
ক) যন্ত্রযুগের কুপরিণাম ১৩
খ) শ্রীল প্রভুপাদের মহা যন্ত্রযুগকে মহামন্ত্র-যুগে পরিবর্ত্তন ১৪
৪। প্রভুপাদ ও ভারত **১৫-১৬**
ক) ত্রৈবির্গক, আপবর্গিক ও পারমার্থিক-রূপে ভারত ত্রিবিধ ১৫
খ) ভারতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য পারমার্থিকত্বই অধুনা লুপ্তপ্রায় ১৫
গ) পারমার্থিক ভারত-সংরক্ষণই প্রকৃত আচার্য্যের কার্য্য ১৫
ঘ) পারমার্থিক ভারতই প্রকৃত স্বাধীন ভারত ও
সে-স্বাধীনতার 'ঝণ্ডা'-ধারণকারী একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদ ১৬
৫। প্রভুপাদ ও গণবাদ **১৮-২০**
ক) গণেশ—অর্থকামী সমগ্র জীবের আরাধ্য-হেতু
বর্ত্তমানে যুগদেবতা ১৮
খ) গণেশ-মস্তকে স্থিত গোবিন্দ-চরণ
মায়ামুগ্ধ জীবের নিকট অদৃশ্য ১৮
গ) গণেশকে শ্রীগোবিন্দ-পদাশ্রিত জানিলেই প্রকৃত চৈতন্যোদয় ১৯
ঘ) চৈতন্য-তত্ত্ব—চৈতন্যহীন-গণের পক্ষে স্পর্শাতীত ১৯
ঙ) শ্রীচৈতন্যভক্তগণের পূজাই—
প্রকৃত 'অর্থ' লাভের প্রকৃষ্টোপায় ২০
চ) প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক অর্থকামিগণের নিকট
প্রকৃত অর্থের সন্ধান-প্রদান ২০
৬। প্রভুপাদ ও সমন্বয়বাদ **২১-২৭**
ক) সমন্বয়বাদ—মায়াবী ও বিশ্বগ্রাসী ২১
খ) কেবলাদ্বৈতবাদ-পর সমন্বয়বাদ সর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতার প্ররোচক ২১
গ) 'সমন্বয়বাদ' বা 'চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ' বলিতে কি বুঝায় ২২
ঘ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মধ্যে চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের খণ্ডন ২২
ঙ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ খণ্ডন ২৩
চ) শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যদেবের মহাচিৎ-সমন্বয়বাদ স্থাপন ২৪

ছ) ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অধর্ম্মেরই মতবাদ—চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ ২৬
জ) প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক এক উদাহরণ-দ্বারা সমন্বয়-বাদের নিরাকরণ ২৬
ঝ) প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিরও ভক্তির সহিত
সমন্বয়ের সন্ধান প্রদান ২৭
৭। প্রভুপাদ ও দেশপ্রেম **২৯-৩৩**
ক) 'দেশপ্রেম'-শিক্ষার কুফল—দেশে দেশে সঙ্ঘর্ষ ২৯
খ) তথাকথিত 'বিশ্বপ্রেম'ও নিতান্তই কাল্পনিক ২৯
গ) চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণের কল্পিত বিশ্বপ্রেমের ছড়াগান ৩০
ঘ) 'জীবে প্রেম' কথার অবাস্তবতা ৩০
ঙ) 'প্রেম'- শব্দের তাৎপর্য্য একমাত্র পরমেশ্বরের প্রীতিবিধান ৩১
চ) অনিত্য বিশ্বে নিত্য 'প্রেমতত্ত্ব' অসম্ভব,
আছে কেবল কামচরিতার্থতা ৩১
ছ) বিশ্ব-মানবের প্রেম-দর্শনে পশুজাতির কটাক্ষ ৩২
জ) শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক বিশ্বমানবকে যথার্থ প্রেম-মার্গ প্রদর্শন ৩৩
৮। প্রভুপাদ ও 'অ্যাপথিওসিস্' **৩৪-৩৮**
ক) দেবতাগণের সহিত প্রতিযোগিতা-মূলে
অসুরগণ-দ্বারা 'দেবতা'-কল্পনা ৩৪
খ) বঙ্গদেশ—নব্য অবতারবাদের উর্ব্বর-ভূমি ৩৪
গ) ''চোর বলে ঐ চোর'' ৩৫
ঘ) শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক 'অ্যাপথিওসিসে'র মস্তকে লগুড়াঘাত ৩৬
ঙ) মনোধর্ম্মী বিশ্বমানবের জীবনের ত্রিসন্ধ্যায় তিন পূজা—
অন্য-পূজা, পুণ্য-পূজা ও শূন্য-পূজা ৩৭
চ) শ্রীল প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত ব্যাসপূজায়
অ্যাপথিওসিসের মূলোৎপাটন ৩৭
৯। প্রভুপাদ ও যুগমানবতা **৪০-৪৩**
ক) অজ্ঞসমাজে—যুগধর্ম্মী ব্যক্তিরই তথাকথিত 'যুগমানবতা' ৪০
খ) কলিযুগে যুগধর্ম্মের দুইটী চিত্র—-'সনাতন-ধর্ম্ম' প্রতি
আক্রমণ ও সনাতন-ধর্ম্মী বলিয়া অভিনয় ৪০

গ) যুগমানবতার দুই রূপ—ভোগ-মানবতা ও ত্যাগ-মানবতা ৪১
ঘ) ত্যাগ-মানবতা—মহামানবতা নহে,
ভোগপরায়ণতারই দ্বিতীয় রূপ ৪১
ঙ) ত্যাগ-মানবতা হইতে জাত আত্মত্যাগ বস্তুতঃ
আসুরিক মনোভাব-বিশেষ ৪২
চ) যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা—
যুগাবতারি-শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়ই প্রকৃত যুগমানবতা ৪২
১০। প্রভুপাদ ও যুক্তবৈরাগ্য ৪৫-৫১
ক) শ্রীরূপ-কথিত 'যুক্তবৈরাগ্যে'র তাৎপর্য্য এক
প্রভুপাদ-দ্বারাই জগতে প্রকাশিত ৪৫
খ) তথাকথিত বৈরাগ্য বস্তুতঃ ভোগের অতৃপ্তি হইতেই জাত ৪৫
গ) ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভোগিমানবগণের দ্বারাই
তথাকথিত বৈরাগ্যের বহুমানন ৪৫
ঘ) অসুরগণেও দৃষ্ট হওয়ায় ফল্গুবৈরাগ্যের আসুরিকতা প্রমাণিত ৪৬
ঙ) স্বয়ং ভগবান্-কর্ত্তৃক তথাকথিত বৈরাগ্যের হেয়তা প্রদর্শন ৪৭
চ) ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণসেবা—
ভোগিগণের চক্ষে প্রাপঞ্চিক কার্য্যবিশেষ ৪৭
ছ) অজ্ঞ ত্যাগপন্থীগণের দ্বারা ভগবান্ ও
ভগবৎপরিকরগণেও দোষারোপ ৪৮
জ) ভাক্ত-সমাজে বৈরাগ্যের নামে ব্যাভিচার ৪৮
ঝ) শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীরূপ-কথিত যুক্তবৈরাগ্যের পুনরুজ্জীবন ৪৯
১১। প্রভুপাদ ও আচার্য্যত্ব ৫২-৬৯
ক) প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি না থাকিলে
'আচার্য্য'-অধ্যয়ন অসম্ভব ৫২
খ) 'নিরপেক্ষতার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তি' বলিতে কি বুঝায় ৫৩
গ) সুষ্ঠু শ্রবণ-পথে কি কি বাধা থাকে ৫৩
ঘ) নিরপেক্ষ-দৃষ্টিতেই শ্রীল প্রভুপাদে
আচার্য্যত্বের যথার্থ্যতা অনুধাবন ৫৪

ঙ) অজ্ঞসমাজ 'আচার্য্য' বলিতে কি বুঝিয়া থাকে ৫৪
চ) তথাকথিত 'আচার্য্য'গণের স্বরূপ ৫৫
ছ) বাস্তব সত্যের বিস্তারকারী 'আচার্য্য' দুর্ল্লভ ৫৫
জ) শ্রীল প্রভুপাদের 'আচার্য্য'ত্ব প্রকাশে
তথাকথিত আচার্য্যগণের অবৈধতা প্রকাশ ৫৬
ঝ) লোক-প্রিয়তা বা লোক-বিদ্রোহিতা আচার্য্যত্বের লক্ষণ নহে ৫৬
ঞ) তথাকথিত ও প্রকৃত আচার্য্যত্ব অধ্যয়নের মধ্যে পার্থক্য ৫৭
ট) শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্বের মহিমা ৫৮
ঠ) তথাকথিত আচার্য্যগণ আত্মার জাগরণ ঘটাইতে অসমর্থ ৫৮
ড) শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বেই প্রকাশিত হইয়াছে,
'হরিভজন' বলিতে কি বুঝায় ৬০
ঢ) শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে বলদেবত্ব প্রকাশিত ৬১
ণ) ময়ূর-পিঞ্ছধারী কাকের কপটতা প্রকাশ হয় ময়ূরের আগমনে ৬২
ত) ভাষা অসমর্থ প্রভুপাদের আচার্য্য-বিগ্রহতার সামগ্রিক বর্ণনে ৬৩
থ) শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব তাৎকালিক নহে, সার্ব্বকালিক ৬৩
দ) শ্রীল প্রভুপাদ—'আশ্রয়বিগ্রহ' ভগবান্;
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহার দ্বিতীয় 'বিষয়' নাই ৬৪
ধ) তথাকথিত আচার্য্য স্বয়ংই ঋণগ্রস্ত,
সুতরাং অপরকে ধনান্বিত করিতে অসমর্থ ৬৫
ন) প্রভুপাদের পূর্ণ ধনময় আচার্য্যত্ব
অপরকেও পূর্ণ ধনশালী করিতে সমর্থ ৬৬
প) শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ণতম আচার-প্রচারের সেনাপতি ৬৭
ফ) শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব—ষড়্গোস্বামী, শ্রীবলদেবাদি
পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচার্য্যলীলার পরিশিষ্টস্বরূপ ৬৮
ব) শ্রীচৈতন্য-নিজজন শ্রীল প্রভুপাদেই যুগাচার্য্যত্ব নিহিত ৬৯
১২। প্রভুপাদ ও সম্বন্ধ-নির্ণয় ৭১-৭৮
ক) সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে চতুর্ব্বিধ শ্রেণী-বিভাগ ৭১
খ) 'সম্বন্ধ' বলিতে কি বুঝায় ৭২

গ) 'বস্তু'-শব্দের তাৎপর্য্য ৭২
ঘ) বস্তুর বস্তুত্ব-প্রমাণে প্রয়োজন—
অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় পরিচয় ৭২
ঙ) উপনিষদে 'সম্বন্ধ'-বিষয়ক বাক্য ৭২
চ) বৃহদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী ৭৩
ছ) সম্বন্ধ' অর্থাৎ 'সম্যক্ বন্ধন'-অর্থের তাৎপর্য্য ৭৩
জ) জড়জগতে সম্যক্ বন্ধন অর্থাৎ সম্বন্ধ অসম্ভব ৭৪
ঝ) শুদ্ধ চেতনে-চেতনেই মাত্র 'সম্বন্ধ'-স্থাপন সম্ভব ৭৪
ঞ) মনোধর্ম্মে গঠিত 'কৃষ্ণ' নহে,
অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'সম্বন্ধে'র বস্তু ৭৫
ট) শ্রীগৌরকৃষ্ণকেই 'সম্বন্ধ'রূপে স্থাপন করিতে
শ্রীল প্রভুপাদের অদ্বিতীয় ভূমিকা ৭৫
ঠ) প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক 'আশ্রয়বিগ্রহে'র সহিত
সম্বন্ধেরই যথার্থতা শিক্ষাপ্রদান ৭৬
ড) শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা—'সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধবিশিষ্ট হও' ৭৭
ঢ) শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধজ্ঞান-শিক্ষাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ৭৭
১৩। প্রভুপাদ ও অভিধেয়-নির্ণয় ৮০-৯৬
ক) সম্বন্ধ'-বিচারের তারতম্যে 'অভিধেয়'-বিচারের তারতম্য ৮০
খ) অতত্ত্বজ্ঞ গোষ্ঠীর বিচারে শুদ্ধভক্তগণ 'গোঁড়া' ৮০
গ) কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখবিধায়িকা শুদ্ধভক্তিই মাত্র
'অভিধেয়'-রূপে নির্ণীত ৮০
ঘ) অজ্ঞসমাজে কেবল নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারিণী 'ভক্তি'ই স্বীকৃত ৮১
ঙ) 'ভক্তি'কে অনেক পন্থার মধ্যে এক পন্থা-রূপে
সুবিধাবাদিগণের ধারণা ৮১
চ) অভিধেয়-নির্ণয়ে শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য ৮২
ছ) স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারী দলের নিকট
ভক্তি ও অভক্তি উভয়ই সমান ৮৩
জ) স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারী দলের স্বরূপ ৮৩

ঝ) অভক্ত-সম্প্রদায়ের যাবতীয় লক্ষ্য ও চেষ্টাই বিপরীত-মুখী ৮৪
ঞ) শুদ্ধভক্তগণ ও অভক্ত-গোষ্ঠীর গন্তব্যস্থল কখনই এক নহে ৮৪
ট) ভক্তের সাধন ও সাধ্য এক বলিয়া ভক্ত অভ্রান্ত;
তদভাবে অভক্তগণ চিরভ্রান্ত ৮৫
ঠ) অভিধেয়-নির্ণয়ে মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক তুলনামূলক উপদেশ ৮৬
ড) পূর্ব্বদিকেই মাত্র সূর্য্যোদয়ের ন্যায় শুদ্ধভক্তিযোগেই
মাত্র ভগবৎপ্রাপ্তি ৮৭
ঢ) দক্ষিণা-মার্গ বা কর্ম্মমার্গে ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব ৮৮
ণ) পশ্চিম-মার্গী অভক্তি-যোগমার্গের কুফল ৮৮
ত) উত্তরা-পথ বা জ্ঞানমার্গে শ্রৌত-ধন লাভ অসম্ভব ৮৯
থ) ভক্তিই একমাত্র 'অভিধেয়'; অভিধেয়-শব্দের অর্থ ৮৯
দ) ভক্তিমার্গে 'অভিধেয়'ই—'প্রয়োজন' ৯০
ধ) চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর 'ভক্তি' ও অভক্তিকে
একাসনে স্থাপনদ্বারা অজ্ঞলোকের বিভ্রান্তি-উৎপাদন ৯০
ন) অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটে
ভাগবতীয় গীতির পুনর্জ্জাগরণ ৯১
প) অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের সান্নিধ্যে
আগত শ্রদ্ধালু বা বিদ্বেষী সকলেরই অভিধেয়-যাজন ৯২
ফ) 'অভিধেয়-শ্রীরূপ—শ্রীল প্রভুপাদ',
এরূপ অধ্যয়নকারীর রূপানুগত্ব লাভ ৯৪
ঙ) কলির তাণ্ডবতাময় জগতে অকৃত্রিম অবিমিশ্র
অভিধেয়-মূর্ত্তি রূপে প্রভুপাদের প্রকাশ ৯৫
ভ) শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—শ্রীল প্রভুপাদ ৯৬

পরিশিষ্ট—

শ্রীল প্রভুপাদ উবাচ ৯৭-১০০

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যুগাচার্য্য—প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর দিব্য জীবনালোকে

আচার্য্যানুশীলন

(১)

জীবন-তরণীর কর্ণধার-নির্ণয়ে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানের আবশ্যকতা

সমস্যা-সমাধান, না সমস্যা-শৃঙ্খল-সৃষ্টি

জগতে অসংখ্য অনন্ত সমস্যারাশি নিত্য নূতনভাবে আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। অসংখ্য অনন্ত সমস্যার আবার অসংখ্য অনন্ত সমাধান সমস্যা-গুলিকে আরও অনন্তগুণে বৃদ্ধি করিয়া সমস্যা-শৃঙ্খল বিস্তার করিতেছে। আমরা সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া আরও নূতন নূতন সমস্যারই সৃষ্টি করিয়া ফেলিতেছি। এইরূপে সমস্যা-সমুদ্রকে কেবল তরঙ্গায়িত করিয়া আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। আমরা সমস্যার সমাধানে যতদূর ব্যস্ত, সমস্যার মূলীভূত কারণ-নির্ণয়ে ততদূরে ব্যস্ত নহি।

সমস্যার জটিলতা-প্রসার

কিন্তু সকল সমস্যার মধ্যে প্রধান কি সমস্যা? কেহ বলিবেন—অর্থসমস্যা, কেহ বলিবেন—রাজনৈতিক সমস্যা, কেহ বলিবেন—আর কিছু। অর্থ-সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান অর্থনৈতিক সমস্যাকে বৃদ্ধি করিতেছে। অর্থ-সমস্যার সমাধানে অন্ন-সমস্যার সমাধান দেখা যায়; আবার অন্ন-সমস্যার সমাধান অর্থ-সমস্যা বা জীবন-সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। রস্‌চাইল্ড অর্থ-রাশির মধ্যে থাকিয়াও অন্নাভাবে মৃত্যুগ্রস্ত হন কেন? দেশে অন্নের স্বচ্ছলতা দেখা

গেলেও অর্থাভাবে লোক অন্নহীন কেন? যদি এ সকল সমাধান মানবের জটিল জীবন-সমস্যাকে শান্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে চার্ব্বাকের—"*ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ*"—এই অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানের পর আর ত্রিতাপ সমস্যার প্রশ্ন উঠিত না। জৈমিনীর 'পূর্ব্ব-মীমাংসা'র পর আবার 'উত্তর-মীমাংসা'র প্রয়োজন হইত না। মীমাংসার মধ্যে এই যে 'পূর্ব্ব' ও 'উত্তর' বিশেষণ, তাহা সমস্যা-সমাধানের পরেও সমস্যার অবকাশের সাক্ষ্য দিতেছে।

উত্তর-মীমাংসার পরও কি মানব-মন, মানব-মনীষা 'মীমাংসা' বা সমাধান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে? আরও কত সন্দেহ, কত সমস্যা, কত বাদ, কত মতবাদ, সমস্যারাশিকে বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ চক্ষু মুদ্রিত, কর্ণ বদ্ধ করিয়া সমস্যা-সমুদ্রের বিরাট্ বাস্তবতা অস্বীকার-পূর্ব্বক সত্যের ঘরে দিনে-দুপুরে ডাকাতি করিতে চাহিতেছে। কেহ কেহ সমস্যা-সাগরের কূল-কিনারা না পাওয়ায় মাঝপথে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়া সমস্যা-সমাধানের স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান কোথায়?

জীবন-সমস্যাই বড় সমস্যা

আমরা জীব—আমাদের জীবন আছে। আমাদের কাছে যত সমস্যাই আসুক না কেন, আমাদের জীবনীকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্যার বৃত্ত-পরিধি রচিত হইয়াছে। অতএব জীবন-সমস্যাই আমাদের কাছে বড় সমস্যা। আমরা জীবন-তরণীটিকে সমস্যা-তরঙ্গায়িত-সমুদ্রে ভাসাইয়াছি—ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদিগকে ভাসাইতে হইয়াছে। এখন সমস্যা, এ তরণী চালাইবে কে? কে কর্ণধার হইবেন? আমি ত' তরণী; আমি কেবল ভাসিতে পারি—তরঙ্গভঙ্গে উঠিতে ডুবিতে পারি—কিন্তু আমাকে ত' আমি নিয়মিত করিতে পারি না—নিয়ামক নিয়মিত করিলে আমি নিয়মিত হইয়া ভাসিতে পারি।

নিয়ামকের সমস্যা—সর্ব্ব-নিয়ামক-সমস্যা

তাহা হইলে এখন দেখা যায়, সর্ব্বপ্রধান সমস্যা আমার নিয়ামকের সমস্যা, জীবন-তরণীর কর্ণধার-সমস্যা। বাস্তবিকই এ সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও

সকল সমস্যার নিয়ামক-সমস্যা। কর্ণধার যেরূপ সমগ্র যাত্রাকে নিয়মিত, সুখকর ও সফল করে, সকল সমস্যার নিয়ামকস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত সমস্যাটীও আমাদের সমগ্র জীবন-সমস্যাকে বর্ত্তমানে নিয়মিত ও সুখকর করিয়া পরিণামে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া থাকে।

জাগতিক ও পারমার্থিক শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য

কর্ণধার বা নিয়ামককে আমরা 'শিক্ষক', 'উপদেশক', 'প্রভু', 'গুরু', 'আচার্য্য' প্রভৃতি শব্দেও অভিহিত করি। আমাদের জীবন-গতির পরাক্ (বহির্ম্মুখী) প্রবৃত্তির মধ্যে যে-সকল শিক্ষক বা উপদেশককে বরণ করি, বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিচারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বতন্ত্রতার নিকট লঘুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐরূপ গুরু-শিষ্যত্বের মূলে যেন—অর্থ-অহমিকা-প্রদীপ্ত ব্যক্তির বৈদ্য ডাকিয়া নিজ রুচির অনুকূল ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা প্রদানের হুকুমের ন্যায় একটা অবগুণ্ঠিত মনোভাব রহিয়াছে। কিন্তু শ্রুতির প্রণালী অন্যপ্রকার,—

শ্রুতি-কথিত গুরু-নির্ব্বাচন-প্রণালী

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

ব্রাহ্মণ 'কর্ম্মচিত' অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত যে ফলসমূহ, উহাদিগকে বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন যে, 'অকৃত' অর্থাৎ যাহা অপরের দ্বারা কৃত বা সৃষ্ট নহে, সেইপ্রকার অতীন্দ্রিয় বস্তু 'কৃতেন'—কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া তিনি কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদগ্রস্ত হইবেন। এইরূপ ব্যক্তি 'সমিৎপাণি' অর্থাৎ সেবোন্মুখ হইয়া সেই 'অকৃত' বস্তু জানিবার জন্য গুরুতেই সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সমস্যা, ব্রাহ্মণ কি-প্রকার গুরুতে অভিগমন করিবেন? শ্রুতি তাহার সমাধান করিয়া বলিতেছেন,—'শ্রোত্রিয়' অর্থাৎ যিনি শ্রুতি-বিদ্যায়

পরিনিষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব্ববিধ সমস্যার মূলোৎপাটন-পূর্ব্বক হৃদয়গ্রন্থি বা সংশয়কোষ ছেদন করিতে পারেন, আর যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠিত থাকিয়া সেই অকিঞ্চনা গুহ্যবিদ্যা শিষ্যের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তিনিই হইলেন সেই 'গুরু', যাঁহার নিকট অভিগমন করিতে হইবে।

বর্ষ-পরীক্ষা

শ্রুতি আরও বলেন,—"**নাসংবৎসরবাসিনে দেয়াৎ**"

অর্থাৎ যিনি সম্বৎসরকাল গুরুদেবের পদান্তিকে বাস না করিয়াছেন, তাঁহাকে গুরুদেব মন্ত্র প্রদান করিবেন না।

'মন্ত্রমুক্তাবলী' প্রভৃতি শ্রুতির অনুগত শাস্ত্র-বাক্যেও দেখা যায়—

"**তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাত্বান্যোন্য-স্বভাবয়োঃ।**
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥"

এক বর্ষকাল সহবাসের দ্বারা পরস্পরের স্বভাব বিদিত হইলে গুরু ও শিষ্য পরস্পরের শিষ্যত্ব ও গুরুত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন।

বর্ষ-পরীক্ষার পথ ও বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথ

বর্ষপরীক্ষার পথটী আরোহ-পথ। কারণ ভ্রম-প্রমাদাদি বহু অনর্থযুক্ত শিষ্য কি প্রকারে পরমমুক্ত শ্রীগুরুদেবকে পরীক্ষা করিতে পারেন? এজন্য যাঁহারা শুদ্ধ শরণাগতি-পথের পথিক, তাঁহারা বর্ত্মপ্রদর্শক বা শ্রবণগুরুর সাহায্য-বলে মহান্তগুরুর সন্ধান পান। তথাপি আমাদের যখন ইন্দ্রিয়জ-চেষ্টা প্রবল থাকে, সে সময়েও আমাদিগকে কর্ম্মরাজ্য হইতে শরণাগতির ক্রম-সোপানে আনয়নের জন্য মহান্ত গুরুদেব তাঁহার নিজ সঙ্গ-দানের দ্বারা ঐরূপ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানদৃপ্ত পথিকের বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রদান করেন।

বর্ষপরীক্ষার পথে সদ্‌গুরুসঙ্গে ক্রম-মঙ্গল

সেইরূপ মহান্তগুরুর সঙ্গক্রমে শিষ্যত্ব-আকাঙ্ক্ষীর মলিনতা যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখনই তিনি শ্রীগুরুকৃপা-লাভে সমর্থ হন। শিষ্যত্বাভিমানীর যে বর্ষকাল অবস্থান-কাল, তাহা শিষ্যত্ব সংগ্রহের উপযোগিতা প্রদানের একটা সুযোগ দান মাত্র। এইরূপ সুযোগ লাভ করিয়া যখন শিষ্যাভিমানী তাঁহার ইন্দ্রিয়জ-

জ্ঞানকে ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত ও মলিনতাগুলিকে অপসারিত করেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে পারমার্থিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে করিতে সেই পাদপদ্মের শোভা দর্শন করিয়া গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হন, তখন,—

"**ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।**
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥" (ভাঃ ২।৮।৬)

যেমন কোন পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজ গৃহে আগমন করেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি আর নিজ-গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যান না, সেইরূপ সিদ্ধান্ত- সলিলের দ্বারা ধৌতাত্মা হইলে শিষ্য গুরু-পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না।

সত্যের আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় সত্যপথ কুহকাবৃত

কিন্তু দেবীধাম কেবল সমস্যার ক্ষেত্র। যিনি প্রকৃত ঐকান্তিক সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহার—"**ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ**" হইলেও মায়াদেবী বাস্তব সত্যবস্তুকে এরূপ অসংখ্য জটিল আবরণে আবৃত বা সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রকৃত সত্যের একটা আনুকরণিক প্রতিযোগিতাময়ী ছবি আমাদের উক্ত সত্যানুসন্ধানকেও সমস্যা-প্রহেলিকাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে সাধারণ লোক বিরাট্ সমস্যা-সন্ধির মধ্যে পতিত হইতেছে।

অবৈধ-প্রতিযোগিতাময়ী ধর্ম্মোন্মত্ততা

এদিকে যেমন 'সত্যনিষ্ঠ' বলিয়া একটা ব্যাপার দেখা যাইতেছে, অপরদিকে একটা অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতাময়ী ধর্ম্মোন্মত্ততা-ব্যাপারও (fanaticism) প্রকৃত সত্যকে সমস্যাময় যবনিকায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কতকগুলি লোক মনে করেন,—'*যদি প্রকৃত ভগবচ্চিহ্নিত বৈকুণ্ঠ-দূত জগদ্‌গুরুপদে বৃত হন এবং অবঞ্চিত নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণ সেই গুরুপাদপদ্মে যদি নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরাও কেনই বা না অসত্য বা কল্পিত বস্তুকে 'পরম সত্য' বলিয়া গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই কল্পিত*

বস্তুকে লইয়া মাতামাতি করিতে পারিলে যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইবে এবং বাস্তবসত্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অন্তর্নিহিত মাৎসর্য্য-পিপাসা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে, তাহা হইতে বিরত হইব? জগতের ধর্ম্মোন্মত্ততার বাজারে এইরূপ যে নায়ক-পূজা, তাহা 'অ্যাপোথিওসিস্' বা ভাষান্তরে 'ব্যুৎপরস্ত' প্রভৃতি, অথবা 'গুরুভক্তি', 'প্রেম' প্রভৃতি নামে প্রচলিত বা প্রচারিত রহিয়াছে। আমরা এইরূপ অনুসরণ না করিয়া বরং জগতের সকল মতবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও তথাকথিত অসাম্প্রদায়িকতাকে তাহাদের যাবতীয় সম্বলের প্রদর্শনী প্রদর্শন করিবার নিরপেক্ষ সুযোগ প্রদান করিব এবং আমাদের বিচারকে নিরপেক্ষতার নির্দ্দোষ তৌলদণ্ডে স্থাপনপূর্ব্বক সত্যানুসন্ধান করিব।

বিচারে বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত নিরপেক্ষতা আবশ্যক

নিজ ক্ষুদ্র ও পরিবর্ত্তনশীল বহু দোষযুক্ত বুদ্ধি-বিবেচনা বা নিজ মনীষার উপর নির্ভরতা কিম্বা অন্তর্নিহিত গোঁড়ামীকে বাহিরে উদারতা বা নিরপেক্ষতার মুখোস পরাইয়া তুলনামূলক বিচারের ভাণে নিজ মনঃকল্পিত মতবাদকে শাস্ত্রসমর্থিত করিবার ছলনা আমাদের বিচার-প্রণালীকে যেন দূষিত না করে। আচার্য্য-শঙ্কর এবং রামানুজ আচার্য্য—এই উভয় আচার্য্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা দেখাইতে গিয়া অনেক সময় আমরা যেরূপ সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট সম্পূর্ণ স্থূল প্রণালী গ্রহণ করি, তাহা কোনরূপেই আচার্য্যত্ব নিরূপণের সহায়ক হইতে পারে না। শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মচারী থাকিবার পর সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর শ্রীরামানুজ বিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন;—শঙ্কর অভুক্ত বৈরাগী, আর রামানুজ ভুক্ত বৈরাগী;—শঙ্কর অষ্টম বর্ষে বা মতান্তরে ষোড়শবর্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন, রামানুজ প্রায় বিংশ-বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের আচার্য্যত্ব শ্রেষ্ঠ—এরূপ অতি স্থূল আধ্যক্ষিক বিচার কখনই আত্মধর্ম্মী বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তি-গণের বিচার হইতে পারে না; অতএব আমরা বিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত আত্মধর্ম্মী পুরুষগণের পন্থানুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আচার্য্যের অনুসন্ধান করিব।

জগৎ ভগবদ্বহির্ম্মুখ গণসমষ্টির আগার

অবশ্য আমরা জানি, এই দেবীধাম ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের কারাগৃহ। এখানে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই ন্যূনাধিক ভগবদ্বহির্ম্মুখ। এই ভগবদ্-বহির্ম্মুখতারূপ সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর ন্যায় জীবসমষ্টিকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই ব্যাধি-দুষ্ট হইয়া আমরা সকলেই ন্যূনাধিক ভগবদ্-বিমুখতার প্রতি রুচিসম্পন্ন। সেই রুচি গণমত-প্রতীকের জিহ্বায় ফুটিয়া রহিয়াছে। কাজেই এখানে বহির্ম্মুখতার যুক্তি বা সিদ্ধান্ত গণমতের মুখে যতদূর রুচিকর বা সমর্থনযোগ্য হইবে, একান্ত ভগবৎসেবানিষ্ঠ সিদ্ধান্ত কিছুতেই ততদূর রুচিকর বা সমর্থিত হইতে পারে না। গণমত যেটুকু ভগবৎ-সেবানিষ্ঠায় রুচির ছলনা লইয়া তৎসমর্থনের ভাণ দেখায়, সেটুকুও আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায়ক ভগবদ্-বহির্ম্মুখতারই প্রকারবিশেষ। সুতরাং এখানে আমরা গণমতের দ্বারা আমাদের নিরপেক্ষতাকে আচ্ছন্ন না করিয়া প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করিব।

সত্য বিপ্লবী—বিদ্রোহী নহে

সত্য জিনিষটী মহাবিপ্লবী, কিন্তু বিদ্রোহী নহে। যখন অসত্যের কুজ্ঝটিকায় রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় সত্যসূর্য্য লোক-লোচনের নিকট আবৃত থাকে, তখন সত্যের প্রতিভা পুনরায় বিকীর্ণ হইলে ভীষণ অন্ধকার হইতে হঠাৎ আলোকে আগত ব্যক্তির নিকট যেরূপ আলোকরশ্মি চক্ষের পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ সত্য-প্রতিভাও কিঞ্চিৎ আপাত পীড়াদায়ক ও বিপ্লবময় বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু সেই আপাত পীড়া আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া পরিণামে বিকল করিয়া দেয় না। বিকল করিয়া দেওয়া বিদ্রোহের কার্য্য, আর বিপর্য্যস্ত ইন্দ্রিয়কে সংন্যস্ত বা যথাস্থানে **পুনঃ সংস্থাপন** প্রাথমিক অনুভূতিতে 'বিপ্লব' বলিয়া মনে করায়। এই বিপ্লবময় তরঙ্গের সাময়িক অনুভূতিকাল বা পরীক্ষার সন্ধিক্ষণটী সহিষ্ণু হইয়া অতিক্রম করিতে পারিলে আমরা "**স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ**" লাভ করিতে পারি। কাজেই আমরা সত্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া যেগুলি আপাত বিপ্লবময় বলিয়া অনুভব করিব,

তাহাতে সহিষ্ণুতা অবলম্বন-পূর্ব্বক যদি নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইব। আমরা এই প্রণালী লইয়াই আচার্য্যানুশীলন বা আচার্য্যানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অনুসরণ-পন্থা

আমাদের এই কার্য্যকে 'অনুসন্ধান' না বলিয়া 'অনুশীলন' (Study) বা '**অনুসরণের** চেষ্টা' বলাই সঙ্গত বিচার করি। কারণ যে স্বপ্রকাশিত সত্য স্বতঃসিদ্ধ নিরপেক্ষতার সহিত স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই আচার্য্য-পাদপদ্মরূপ বাস্তব সত্যকে অনুশীলন করিবার চেষ্টা দ্বারাই তাঁহার বাস্তব সত্যতা নিরপেক্ষ নির্ম্মল হৃদয়ে প্রকাশিত হয়,—ইহাই শ্রৌত বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মীমাংসা—

''সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।''

কারণ নিজে অভিজ্ঞান সম্বল করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা বহুরূপিণী মায়ার কোনপ্রকার ছলনায় বাহ্য চাক্‌চিক্যময় ছবি দেখিয়া মায়ামৃগ-অনুসন্ধানের ন্যায় বৃথা দৌড়াইয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারি; কিন্তু সত্যস্বরূপের অনুশীলন করিবার অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা পিপাসা যদি আমাদের হৃদয়ে অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সত্যস্বরূপ ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদের সেই অনুশীলন-পিপাসার নিকট তাঁহার পরম সত্যামৃত প্রেরণ করিবেন। তাই আমরা স্বপ্রকাশিত বা ভগবৎপ্রেরিত আচার্য্যের অনুসন্ধানের দাম্ভিকতা না লইয়া অনুশীলনের সেবোন্মুখতা- প্রণালীই বরণ করিব। আমরা নানা দিক্ দিয়া আচার্য্যের অনুশীলন বা অনুসরণ করিয়া দেখিব যে, সেই সকল দিগ্‌দর্শনের মধ্যে কোন্‌দিকে প্রকৃত আচার্য্যের পদনখ-চন্দ্রের পৌর্ণমাসী বিশ্বকে অসমোর্দ্ধ্ব শোভাময়, মঙ্গলময়, শান্তিময় ও সার্থকতাময় করিয়া তুলিতে পারে।

(২)
প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান জগৎ

'বর্ত্তমান জগৎ' কথার তাৎপর্য্য

সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক বা পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা—পরিবর্ত্তনশীল কাল বা দেশের পরিবর্ত্তনশীল পাত্র না হইলেও কোন বিশেষ কাল বা দেশ সেইরূপ আচার্য্যকে পাইয়া কৃতার্থ হয়। দেশ ও কালকে সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়া দেশ ও কালাতীত সনাতনী বাণীতে উদ্ভাসিত করিবার জন্য আচার্য্যের আগমন যুগে যুগে সাধিত হইয়া থাকে। 'বর্ত্তমান জগৎ' কথাটী বড় ব্যাপক; দ্বিতীয়তঃ 'জগৎ'-শব্দে গমনশীলতা বা পরিবর্ত্তনশীলতা সূচিত করে। কাজেই বর্ত্তমানতা বা স্থায়িত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার জগতে প্রকৃতপ্রস্তাবে আরোপিত হইতে পারে না। জগৎ স্রোত-প্রবাহের ন্যায়। যে-ক্ষণে যে-প্রবাহে লক্ষ্য করিয়া 'বর্ত্তমান' বলা হইতেছে, তৎপরক্ষণেই আর একটী দ্বিতীয় প্রবাহের বর্ত্তমানতা সেই স্থান অধিকার করিতে না করিতেই তৃতীয় প্রবাহের বর্ত্তমানতার জন্য অবকাশ প্রদান করিতেছে।

জগজ্জীবের 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' নামক দুই মায়ামৃগের পশ্চাৎ ধাবমানতা

তবে এইরূপ পরিবর্ত্তনশীলনতার মধ্যে যে একটা অন্তর্নিহিত ধারা জগৎকে জীবন্তবৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে আমরা একটী শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি; সেই শক্তিটী জড়শক্তি। সেই শক্তি এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটী সহোদর পুষ্পের ন্যায় সমগ্র জগতের মানবকে তাহাদের আপাত রমণীয় শোভায় প্রলুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর মানুষ বা জীব তাহাদের যাবতীয় সাধনা, সিদ্ধি, তৎপরতা, অনুষ্ঠান সেই দুইটী মায়ামৃগের আশায়ই নিয়োজিত করিতেছে। এই দুইটী মায়ামৃগই জীব-সঙ্ঘকে ধাবনপর বা কর্ম্মপ্রবণ রাখিয়া জগতের প্রতীকত্ব সংরক্ষণ করিয়াছে। ঐ দুইটী মায়ামৃগের ললাটে 'ভোগ' নামাঙ্কিত সিন্দুরবিন্দু ও 'ত্যাগ' নামাঙ্কিত ত্রিপুণ্ড্র-তিলক পরাইয়া দেওয়া

যায়। বর্ত্তমান জগৎ আন্দোলনময়। কেহ বলিবেন,—এই আন্দোলন রাজনীতির পতাকা লইয়া বর্ত্তমানতাকে আত্মসাৎ করিয়াছে; কেহ বলিবেন,—আর কিছু। কিন্তু এই সব কিছুর পরিচালক কে? যাঁহারা খুব শক্তিশালী সুবৈজ্ঞানিক দুরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া জগতের এই বর্ত্তমানতার সমগ্রতাকে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদের পরীক্ষিত জ্ঞান প্রচার করে যে,—ভোগলালসাই এই সকল কিছুর পরিচালিকা; আর ঐ ভোগলালসার সহোদরা ভগ্নীই বাহ্যে সাপত্ন্য-ভাব (সতীন-ভাব অর্থাৎ শত্রুভাব) প্রদর্শনকারিণী 'ত্যাগ-লালসা'।

'ভোগ' ও 'ত্যাগ' লতা ব্রহ্মাণ্ড-বর্ত্তিনী,
কিন্তু 'ভক্তি' লতা ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী

কিন্তু উভয়ই একই লতার দুইটী বৃন্তের পাশাপাশি যুগল পুষ্প। যে লতাটী হইতে ঐ দুইটী পুষ্পের উদ্ভব, সেই লতা পরাগ্ (বহির্ম্মুখ) গামিনী পুষ্পিতা লতা। প্রত্যগ্ (অন্তর্ম্মুখ) গামিনী আর একটী লতা আছে, সেই লতা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অধোমুখে নয়, তাহা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধমুখ বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোকে এক মহাকল্যাণ-কল্পতরুর মূলে আশ্রয় লাভ করে; আর পূর্ব্বোক্ত পরাগ্‌গামিনী লতা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অধোভাগে গমন করিয়া "**ঊর্দ্ধমূলমধঃ-শাখামশ্বত্থং**" আশ্রয় করে। 'ত্যাগ' নামক ত্রিপুণ্ড্র-শোভিত মায়ামৃগটী পূর্ব্বোক্ত মৃগ হইতে আরও অধিকতর প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসঘাতক হইয়া জগতের বর্ত্তমানতাকে এরূপ আত্মসাৎ করিয়াছে যে, প্রত্যগ্‌গামিনী লতার কমনীয়তা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। লতা কোথায় 'বিরজা'-স্নানে✶ সঞ্জীবিত হইয়া মলিনতার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্পতরুর আলিঙ্গনের অভিসারে ধাবিত হইবে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে 'বিরজা'র তটেই আত্মহত্যা করিতেছে। কখনও বা বিরজা-স্নানের অভিনয় করিয়া 'পুরুষে'র অঙ্গপ্রভার নিকট মরমে মরিয়া যাইতেছে। সেই মর্ম্মান্তিক মৃত্যু [ত্রিপুণ্ড্র-ধারিগণকে] 'পুরুষে'র আলিঙ্গন হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিতেছে।

✶ বিরজা-স্নান—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ মধ্যে অবস্থিত পরিখা-স্বরূপই 'বিরজা' নদী বা 'কারণ-সাগর'। বিগত হইয়াছে রজঃ যাহা হইতে, তাহাই 'বিরজা'। বিরজা-স্নান বলিতে গুণত্রয়ের আবিলতা-মুক্ত অবস্থা লক্ষিত হইয়াছে।

ভোগ-ত্যাগোন্মুখ বিশ্বে প্রভুপাদের সনাতন সত্য পুনঃস্থাপন

যখন যুগের এইরূপ বর্ত্তমানতা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই বর্ত্তমান জগতে ভোগ-ত্যাগ-পিশাচীর কবল হইতে সমগ্র চেতনাকে উদ্ধার করিয়া কল্যাণ-কল্পতরুর প্রত্যক্ (অন্তর্ম্মুখ) পথে চালিত করিবার একজন কর্ণধারের অবতরণ বর্ত্তমান জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছে। যাঁহারা নিরপেক্ষতাকে 'মুক্তপ্রগ্রহ'-বৃত্তিতে† অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমান জগৎ এই ভোগ ও ত্যাগের লালসায় যেরূপ সংক্রামিতভাবে কবলিত এবং তাহার প্রতিক্রিয়ার কুফল দর্শন করিয়াও তাহার যুগ্-যুগান্তরীন্ অভ্যাসগত মাদকতা পরিত্যাগে যেরূপ অসমর্থ, তাহাতে বর্ত্তমান জগতে একটা বিপ্লবময়ী অথচ সনাতনী চিদুন্মেষণী বাণীর ধ্বনি আমাদের কর্ণপটহ ভেদ করিতে না পারিলে আমরা কিছুতেই কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইতে পারি না। নিরপেক্ষতার তৌলদণ্ডে আমাদের বিচারকে স্থাপন করিলে আমরা দেখিতে পাইব—শ্রীল প্রভুপাদ গতানুগতিক ভোগ ও ত্যাগের বর্ত্তমান জগতের পরাঙ্মুখী চিন্তাধারার নিকট একটা অশ্রুতপূর্ব্ব সনাতনের বিজলী-সঞ্চার আনয়ন করিয়া মানবজাতির মনীষাকে তাহাদের নিজ নিজ অধিকার-অনুযায়ী ভাবনা-মার্গের প্রত্যক্ (অন্তর্ম্মুখ) পথের দিকে চালিত করিবার সুযোগ দিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের মানবজাতি সেই পরম বাস্তব সনাতন সত্যের কথা একেবারে বা একদিনে ধারণ করিয়া উঠিবার অধিকারী না হইলেও তাঁহারা ভাবনার জন্য যে একটা অবসর পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের অধিকার বিকশিত করিয়া একান্ত বাস্তব সত্যের প্রতি ব্যষ্টিগত আকাঙ্ক্ষাকে সমষ্টিগত লালসায় পূর্ণতা প্রদান করিবে। ইহা সমসাময়িক জগতের পক্ষে একটা সর্ব্বোচ্চ আশার কথা। চিরকালই 'বর্ত্তমান'—কোন সনাতনকে সম্পূর্ণভাবে ধরিতে পারে না। তবে সেই বিশিষ্ট বর্ত্তমান—সনাতনের জন্য যে-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র-কর্ষণ বা ভাবনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া যায়, তাহাই ভবিষ্যতে বিশ্বমঙ্গল-মহাতরু বা পরম-শান্তির মহাসৌধের উদ্ঘাটন-উৎসব করিয়া থাকে।

† মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তি—৫৩ পৃষ্ঠায় 'নিরপেক্ষতার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তি বলিতে কি বুঝায়' দ্রষ্টব্য।

(৩)

প্রভুপাদ ও যন্ত্রযুগ

যন্ত্রযুগের কুপরিণাম

বর্ত্তমানযুগকে সমসায়িক মনীষিগণ 'যন্ত্রযুগ' নামে অভিহিত করেন। জড়বিজ্ঞানের উন্নতিক্রমে বাষ্পীয় যান, মটোরযান, টেলিগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, সাবমেরিণ্, এরোপ্লেন এবং কত অসংখ্যপ্রকার যন্ত্র বর্ত্তমানযুগকে প্লাবিত করিয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে মানবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং ঐ জীবন-যাত্রার অন্তর্নিহিত ভোগাকাঙ্ক্ষা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যেরূপ অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে এই যন্ত্রযুগের অভ্যুদয় হইতেছে, তাহাতে অনেক দূরদর্শী মনীষী অচিরেই উহার একটী অবশ্যম্ভাবী ভীষণ প্রতিক্রিয়া অনুমান করেন। এই যন্ত্রযুগের সার্থকতার পরিণাম গত পাশ্চাত্য মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

অনেকে আশঙ্কা করেন, এই যন্ত্রযুগ জীবনযাত্রাকে যেরূপ স্বচ্ছন্দ ও সহজ করিয়া দিয়াছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে অন্তরে মানবজীবনকে অত্যন্ত কৃত্রিম করিয়া তুলিয়া জগন্নাশকর লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করিতেছে। পরিণামে দেখা যাইতেছে, এই যন্ত্রযুগ মানুষকে ভোগে অত্যন্ত কর্ম্মক্ষম করিয়া পরিণামে অন্তঃসার-শূন্য বিকলেন্দ্রিয় করিয়া ফেলিতেছে। এত কর্ম্মপরতা পরিণামে যে-ফল প্রসব করিতেছে, তাহা আত্মবিনাশকর ও জগন্নাশকর।

কিন্তু যন্ত্রযুগের সাময়িক উত্তেজনা আপাত প্রেয়ের মোহিনী মাদকতায় মত্ত হইয়া পরিণাম দেখিবার বা ভাবিবার অবসর পাইতেছে না। সমাজ, জাতি বা দেশ—যাহা দেহৈকসর্ব্বস্ব জগতের লক্ষ্য বস্তু, তাহাও মৃত্যুর পথে ধাবিত হইতেছে। জাতির সমগ্র কর্ম্মপরতা ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের প্রয়াসের ন্যায় পণ্ড-পরিশ্রম এবং তৎফলস্বরূপ সমূহ অপচয় মাত্র সার হইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের মহা যন্ত্রযুগকে মহামন্ত্র-যুগে পরিবর্ত্তন

এইরূপ যন্ত্রযুগ কিরূপভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়া জাতির, সমাজের, দেশের, সমগ্র জৈবজগতের এমন কি, নিখিল চেতনের সর্ব্বোত্তম উপকার সাধন করিতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা নিরপেক্ষ বিচারে প্রভুপাদের অমানুষী প্রতিভা দেখিতে পাই। মুদ্রাযন্ত্র, তড়িদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি জড়বিজ্ঞান-সম্ভূত যন্ত্রসমূহ এতদিন কেবল অচৈতন্য বাণীর সেবা-সাধক হইয়া অচৈতন্য বিশ্বের অচৈতন্যভাব পুষ্টি করিতেছিল। জড়যন্ত্র ভোগের সাধক না হইয়া ভোগাতীত জড়বন্ধ-নির্ম্মুক্ত কোন মহা জগন্মঙ্গলকর কার্য্যের সাধক হইতে পারে, ইহা গতানুগতিকতার নিকট মহা আশ্চর্য্যকর ও বিপ্লবময় মনে হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র যন্ত্রযুগকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পথের অনুকূল করিয়া প্রভুপাদ ভোগী ও ত্যাগীর গণগড্ডালিকার গতানুগতিক ধারণায় মহাবিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। যাবতীয় যন্ত্র বিশ্বযন্ত্রীর নিয়ামকত্ব লাভ করিয়া জড়তা ও হেয়তার সঙ্কীর্ণগণ্ডী হইতে চিদ্ভাব-উন্মেষণতার অভিযানে উন্মুখী হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান জগতের এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ জগতের জন্য মহা কল্যাণ-কল্পতরুর বীজ রোপিত হইয়াছে।

মুদ্রাযন্ত্র আজ শ্রীচৈতন্য-কথা বিস্তার করিতেছে, তার ও বেতার-বার্ত্তা শ্রীচৈতন্যবাণী ঘোষণা করিতেছে, বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক যান প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যকথা-প্রচারকগণকে দেশ-দেশান্তরে বহন করিয়া অল্পায়ু কলি-মানবের '*সময়ই অর্থ অথবা পরমার্থ*'—এই নীতির সাফল্যবিধান করিতেছে। ফটোগ্রাফি শ্রীচৈতন্যকথার প্লাবনক্ষেত্র-সমূহকে, শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-প্রচারকগণকে আলেখ্যিত করিয়া চেতনতার উদ্দীপনা জাগাইতেছে। জগন্নাশকর জড়ত্বের প্রভাব ক্রমে শিথিল হইয়া এই মহাযন্ত্রযুগকে 'মহামন্ত্র'-যুগ করিয়া তুলিতেছে। এখানে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অমিতপ্রভাব লক্ষ্য করি।

(৪)

প্রভুপাদ ও ভারত

ত্রৈবির্গক, আপবর্গিক ও পারমার্থিক-রূপে ভারত ত্রিবিধ

ভারতকে আমরা অনেকদিক দিয়া আলোচনা করিতে পারি। ত্রৈবর্গিক ভারত, আপবর্গিক ভারত ও পারমার্থিক ভারত; মোটামুটি এই তিনটী বৈজ্ঞানিক শ্রেণীতে ভারতকে কেন্দ্রীভূত করিলে ত্রৈবর্গিক ভারতের ভিতর রাজনৈতিক ভারত, অর্থনৈতিক ভারত, ধার্ম্মিক ভারত প্রভৃতি দেখিতে পাই। ধার্ম্মিক ভারতের মধ্যে বর্ণাশ্রমিক ভারত কেহ কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন। আবার আপবর্গিক ভারতের মধ্যে মুক্তিকামী ভারত লক্ষ্য করি।

ভারতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য পারমার্থিকত্বই অধুনা লুপ্তপ্রায়

কিন্তু একান্ত পারমার্থিক ভারত ঐসকল শ্রেণীকে অতিক্রম করিয়া তাহার স্বতন্ত্রতার স্বরাজ্য স্থাপন করে। সমসাময়িক ভারত ত্রৈবর্গিক তৃষ্ণায় এতদূর ত্রিতাপগ্রস্ত যে, ঐকান্তিক পারমার্থিক ভারতের কথা তাহার লুপ্ত স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। জগতের মনিষীগণ, শুভানুধ্যায়িগণ, নেতৃবর্গ, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বিগণ এবং প্রচারিত ভক্তগণ ত্রৈবর্গিক ভারত, আপবর্গিক ভারতের শুভানুধ্যান করেন; কিন্তু একান্ত পারমাথিক ভারত—যাহা ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য, সহজ স্বভাব ও মর্ম্মস্থান, তাহাকে বিরাট্ বহির্ম্মুখ গণদেবতার শুণ্ড (গণেশের শুঁড়) আবৃত করিয়া নির্ম্মল পারমার্থিকতার সহিত আর্থিকতার ধূলিকঙ্কর মিশ্রিত করিয়া ফেলে। হস্তীকে নির্ম্মল গঙ্গাজলে অবগাহন করাইলেও অব্যবহিত পরেই যেরূপ হস্তী শুণ্ডের সাহায্যে সমস্ত অঙ্গে ধূলি বিলেপন করে, তদ্রূপ।

পারমার্থিক ভারত-সংরক্ষণই প্রকৃত আচার্য্যের কার্য্য

বহির্ম্মুখ গণদেবতা যখন বহির্বিচরণশীল শুণ্ডের যাহায্যে নির্ম্মল পারমার্থিকতায় বিবিধ আবিলতার ধূলি বিলেপন করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ পারমার্থিক ভারতকে ত্রৈবর্গিক, আপবর্গিক বা অচিৎ-নৈর্ব্বাণ-বর্গিক করিয়া

ফেলিতে চাহে, তখন ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য যিনি অকৈতবভাবে রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত 'আচার্য্য'-পদবাচ্য। যাঁহারা নিছক নিরপেক্ষতার প্রত্যক্ষ প্রমাণে ইহা অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন, নানাবিধ মতবাদ, বহুরূপী ত্রৈবর্গিক ও চাতুর্ব্বর্গিক ছলনাময় গণদেবতার শুণ্ড হইতে সমসাময়িক ভারতের আন্তরিক অকপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে শ্রীল প্রভুপাদ কিরূপভাবে রক্ষা করিয়াছেন।

পারমার্থিক ভারতই প্রকৃত স্বাধীন ভারত ও সে-স্বাধীনতার 'ঝণ্ডা'-ধারক একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদ

"**ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥**"—শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণী ভারতকে যে পারমার্থিকতার স্বারাজ্য-সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, সেই স্বারাজ্য-লক্ষ্মীর পতাকা শ্রীল প্রভুপাদই সমসাময়িক ভারতে উড্ডীন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন—আর্থিক বা আপবর্গিক ভারতের বিদেশীয় আমদানী পরধর্ম্মের প্রতি যে আনুকরণিক সংক্রামক পিপাসা, তাহা ভারতের 'নিজস্ব' নহে। নির্ম্মল পারমার্থিকতাই ভারতের চিরন্তন নিজস্ব, তাহাই আমাদের জন্মাধিকার। পারমার্থিকতার স্বারাজ্য-স্থাপনই আমাদের ভারতের স্বাধীনতা। ভারতের সেই স্বাধীনতা-রবি অন্যান্য ত্রৈবর্গিক বিশ্বের ছলনাময়ী বিশ্বাসঘাতিনী স্বাধীনতা-নামধারিণীর কপটতাকে উন্মুক্ত করিয়া দিবে; ইহা প্রভুপাদের পারমার্থিক ভারত-বোধনের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। পারমার্থিক ভারতই প্রকৃত স্বাধীন ভারত, একথা কেহ কেহ বদ্‌হজমী মৌখিকতায় ইঙ্গিত দিলেও কার্য্যকালে পায়সান্নের সহিত কিঞ্চিৎ পঙ্ক মিশ্রিত করিয়া ফেলিবার ন্যায় চিজ্জড়-সমন্বয়ের আপাত মনোহারিণী মনীষা অনেককেই বিভ্রান্ত করিয়া পারমার্থিক ভারত হইতে তথাকথিত আর্থিক ভারতের দিকে টানিয়া লইয়াছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ নিথর নিরপেক্ষ হইয়া পারমার্থিক ভারতের অব্যভিচারিণী স্বাধীনতার 'ঝণ্ডা' ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

(৫)

প্রভুপাদ ও গণবাদ

গণেশ—অর্থকামী সমগ্র জীবের আরাধ্য-হেতু বর্ত্তমানে যুগদেবতা

বর্ত্তমানযুগ—গণবাদের✶ যুগ। গণবাদ-দেবতা তাঁহার বিস্তৃত শুণ্ড (শুঁড়) এই বিশ্বে বিস্তৃত করিয়া সকলকে আত্মসাৎ করিয়াছে। গণ-দেবতাই এই দেবীধামের যুগদেবতা হইয়াছে। গণ-দেবতা (গণেশ) বৈশ্যগণের আরাধ্য। বর্ণাশ্রমিক ভারত বর্ত্তমান যুগে বৈশ্য-ভারত বা বৈশ্য-জগতে পরিণত হইয়াছে। অর্থনৈতিক সিদ্ধি এবং তাহার বিঘ্ন-বিনাশের জন্যই জগৎ প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈশ্যকুল-ধুরন্ধর কোন মনীষীর অঙ্গুলী-হেলনে আজ জগৎ গণবাদ-দেবতার পূজাবেদীতে উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিকই দেবীধামে গণশক্তির নিকট সকল জাগতিক শক্তি পরাস্ত হয়। রাজশক্তিও গণ-শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে ও করিতেছে, জগতে দুর্দ্দান্ত রাজশক্তিও গণ-শক্তির নিকট পরাভূত হয়। কামান, গুলি, গোলা গণশক্তিকে বিজিত করিতে পারে না; পরিণামে গণশক্তিই জয়যুক্ত হয়। সুতরাং এই প্রত্যক্ষ-প্রতারিত বিশ্ব গণশক্তি বা গণবাদ-দেবতা অপেক্ষা আর অধিক জাগ্রত দেবতা বা আশু-সিদ্ধিদাতা দেবতার প্রতীক কল্পনা করিতে পারে না।

গণেশ-মস্তকে স্থিত গোবিন্দ-চরণ মায়ামুগ্ধ জীবের নিকট অদৃশ্য

কিন্তু যাঁহারা এই গণদেবতার চরণ-ছায়ার তলে মাথা নত করিয়াছেন, তাঁহারা গণদেবতার মাথার উপর যাঁহার পাদপদ্ম রহিয়াছে, কি করিয়া সেই পাদপদ্ম দেখিতে পাইবেন? গণপিতামহ ব্রহ্মা একদিন সেই পাদপদ্মের স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-দ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

✶ গণবাদ—জনগণ-মধ্যে বহুর দ্বারা স্থিরীকৃত মতবাদ।

অর্থাৎ, যে গণাধিরাজ (গণেশ) ত্রিজগতের বিঘ্ন-বিনাশ-সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য প্রণামকালে স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর যাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

গণাধিরাজের মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর যে আদিপুরুষের পাদপদ্ম বিরাজিত, গণাধিরাজের চরণছায়ার তলে আবৃত গণ-গড্ডলিকা সেই পাদপদ্ম দেখিয়া উঠিতে পারে না। কারণ সেই সময় তাহারা ঐদিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া গণদেবতার চরণ-ছায়ায়ই আবৃত হইয়া থাকে।

গণেশকে শ্রীগোবিন্দ-পদাশ্রিত জানিলেই প্রকৃত চৈতন্যোদয় ঘটে

যাঁহারা সেই ছায়ার আবরণে নতমস্তক উত্তোলন করিয়া আদিপুরুষকে দর্শন করিবার যত্ন করেন এবং গণাধিরাজকে গোবিন্দের পাদপদ্মে প্রণত দর্শন করেন, তাঁহারাই গণ-পিতামহ ব্রহ্মার শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া গোবিন্দ-গণে গণিত হইতে পারেন। তখন তাঁহারা গণদেবতা-গণের মস্তককে সোপান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে করিতে আদিপুরুষ গোবিন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন। তখন অচৈতন্য গণবাদ-দেবতার প্রতীকের বিসর্জ্জন হয় এবং সে-স্থানে শ্রীচৈতন্য-গণদেবতার নিত্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

চৈতন্য-তত্ত্ব—চৈতন্যহীন-গণের পক্ষে স্পর্শাতীত

প্রভুপাদ বিশ্বে সেই শ্রীচৈতন্য-গণদেবতার নিত্যমূর্ত্তির পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অচৈতন্য গণবাদের যে ভঙ্গুর প্রতীক-পূজা বা বিশ্বগ্রাসিনী পৌত্তলিকতা, তাহা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিতেছেন। বহির্ম্মুখ গণমতের দ্বারা কখনই পারমার্থিক ভারত শাসিত বা বিজিত হইতে পারে না, ইহাই প্রভুপাদের প্রচার-পতাকায় অঙ্কিত রহিয়াছে। **গণশক্তি অপর জড়শক্তিকে করতলগত করিতে পারে, কিন্তু গণশক্তি চৈতন্যশক্তিকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না।** গণশক্তির চৈতন্যশক্তিকে স্পর্শ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা রাবণের মায়াসীতা-হরণের ন্যায়। আমরা এই ত্রিতাপময় কারাগারে কেহ সশ্রম দণ্ডে, কেহ বা অশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আবদ্ধ রহিয়াছি এবং বদ্ধাবস্থায় কারাগারে গণদেবতা-প্রতীকের পূজা করিবার ধর্ম্মোন্মত্ততা দেখাইয়া আমাদের অধিকার অটুট রাখিবার

চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু কারাগারে বদ্ধজীব আমরা কারাতীত, মায়াতীত আদি-পুরুষের কি করিয়া সন্ধান পাইব? সেই আদিপুরুষের বার্ত্তা গণবাদ কি করিয়া বলিবে?

শ্রীচৈতন্যভক্তগণের পূজাই—প্রকৃত 'অর্থ' লাভের প্রকৃষ্টোপায়

প্রভুপাদ বিশ্বকে নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা জানাইয়াছেন, যদি চৈতন্য-রাজ্যের কোন কথা কেহ নিরপেক্ষ নির্ম্মল-ভাবে বলিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে চৈতন্য-গণে প্রবেশ করিতে হইবে। অচৈতন্য গণদেবতার অনিত্য মূর্ত্তির পূজা বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীচৈতন্য-গণদেবতার নিত্যমূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। গোবিন্দ-গণের দ্বারা বিশ্ব চালিত হইলেই প্রকৃত সিদ্ধির পথ আবিষ্কৃত হইবে। সিদ্ধিদাতা গৌর-গোবিন্দ-গণদেবতা বা গৌরগণশক্তির পূজা প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রকৃত ব্যবসায়াত্মিক বৈশ্যজগৎ প্রকটিত হইবে। তখন তাহাকে প্রাকৃত অর্থনৈতিক না বলিয়া প্রকৃত অর্থনৈতিক বা পরমার্থনৈতিক বিশ্ব বলা যাইবে।

প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক অর্থকামিগণের নিকট প্রকৃত অর্থের সন্ধান-প্রদান

সেই বৈশ্যজগৎ প্রীতির পসরা লইয়া রূপের হাটে রূপচিন্তামণিকে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে। সিদ্ধিদাতা চৈতন্য-গণদেবতার উপাসক না হইলে সেইরূপ বৈশ্য হওয়া যায় না। সেই বৈশ্য-বিশ্বে "*ফেল কড়ি, মাখ তেল*"—কর্ম্মজগতের এইরূপ কাণাকড়ির কারবার নাই। সেখানে চিন্ময়ী মতির লৌল্য-মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়। সেখানকার গণশক্তি একচ্ছত্র বিশ্ব-সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, চতুরস্ত্রধারী পরাৎপর রাজশক্তিকেও পরাভূত করিয়াছে; অধিক কি, স্বরাট্ আদিপুরুষ অজিতকেও জয় করিয়াছে। সেই গোবিন্দগণশক্তির ঔদার্য্য-বিদ্যায় বিশ্ব পরিচালন করিবার জন্যই প্রভুপাদের অবতরণ। বিশ্ব যদি প্রকৃত আত্যন্তিক বিশ্ব-মঙ্গল অভিলাষ করেন, তাহা হইলে এই অচৈতন্য-গণবাদ-দেবতার অনিত্য প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীচৈতন্য-গণদেবতার নিত্য-মূর্ত্তির পূজায় দীক্ষিত হউন। প্রভুপাদ গণবাদের যুগে শ্রীচৈতন্য-গণ-পূজার দীক্ষা বিতরণের জন্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

(৬)
প্রভুপাদ ও সমন্বয়বাদ

সমন্বয়বাদ—মায়াবী ও বিশ্বগ্রাসী

তথাকথিত 'সমন্বয়বাদ' প্রচলিত গণদেবতা-পূজারই একটী যৌগিক বিভূতি। এই বিভূতি গণ-সমষ্টিকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছে যে, সেই কাল-কামিনীর নিকট গণসমষ্টি তাহাদের নিরপেক্ষ স্বাধীন বিচারকে বলি দিতে বসিয়াছে। সমন্বয়বাদ মায়াবীর ন্যায় বিশ্বগ্রাস করিতেছে। বহির্ম্মুখতার যে উপাদান ও উপযোগিতা, তদ্দ্বারাই বিশ্বের বিশ্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিশ্ব—বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতি এবং বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের বসতিস্থল; সুতরাং বিশ্বের উপাদানে ও উপযোগিতায় যে ধর্ম্ম সহজ, সেই ধর্ম্ম যদি বিভূতির চাক্‌চিক্য ও উন্মাদনা লইয়া আপনাকে রূপ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই রূপ কেনই বা বিশ্বগ্রাস না করিবে?

কেবলাদ্বৈতবাদ-পর সমন্বয়বাদ সর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতার প্ররোচক

"*অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যা' ইচ্ছা তাই কর*"—চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের এই প্রতিজ্ঞা বিভিন্ন বহির্ম্মুখ রুচির সর্ব্বপ্রকার কামুকতাকেই সমর্থন করে। কাজেই গণসমষ্টি 'যাহা ইচ্ছা, তাহা করা'কেও ধর্ম্মের 'দোহাই' এর মধ্যে সমর্থিত দেখিয়া নির্ভাবনায় 'যাহা ইচ্ছা, তাহা করা'র পথে চলিতেছে। এইরূপে সমন্বয়বাদ শাস্ত্র বা শাসন-পরিমুক্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ধাবিত হইয়াও 'উদার'তার বানিজ্যচিহ্ন ধারণ করায় বিশ্ব-বিপণির (world market) মধ্যে যে বহুল প্রচারিত হইয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশ্ব যাহা চায়, সমন্বয়বাদ তাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। বিশ্ব চায়—প্রেয়ঃ, তাহাতে বিশ্বের উপযোগিতা ও ধ্যান সহজ; সমন্বয়বাদ সেই উপযোগিতা ও ধ্যানকে আরও স্বচ্ছন্দ করাইয়াছে। শুধু সহজ করায় নাই, সেই সাহজিকতার ভিতর ধর্ম্ম ও উদারতার 'ভাবনা' দিয়া সংক্রামক ও উত্তেজক করিয়া দিয়াছে। ভোগ-প্রগতির নির্ব্বিশেষগতি বা আত্মপাতই হইল বিশ্বরূপের রূপমাধুরী। সমন্বয়বাদ সেই

রূপমাধুরীতেই গণগড্ডলিকার বিকৃত সহজবৃত্তিকে তৈল সঞ্চার করিয়াছে।

'সমন্বয়বাদ' বা 'চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ' বলিতে কি বুঝায়

মানুষ বা জীব অচেতনের আধারে সুপ্ত চেতন সংরক্ষণ করিয়া 'চিদাভাস' মনের প্রেরণায় অচেতন বিশ্বে চলাফেরা করিতেছে। কেবল চেতনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ নাই; চিদাভাসের সহিত তাহার মাত্র সংস্পর্শ। চিদাভাস —চেতনেরই প্রতিফলিত বিভূতি। সুতরাং সেই বিভূতি—অনাবিল চেতনের কোন ভাবনা ভাবিতে পারে না, ভাবিতে গেলেই তাহাকে চিৎ-অচিৎ মিশ্রিত করিয়া ভাবিতে হয়। এই চিৎ-অচিৎ-মিশ্র জ্ঞান-ভাণ্ডারই চিজ্জড়- সমন্বয়বাদের আধার। সুতরাং মানুষ বা গণসমষ্টি যাহা ভাবিলেন, তাহা চিজ্জড়-মিশ্রিত বা চিজ্জড়-সমন্বয় ব্যতীত আর কিছু অধিক হইতে পারে না। এই গণসমষ্টি 'মায়াতীত' বস্তুর মৌখিক প্রতিজ্ঞা বা অনুসন্ধান করিলেও 'মায়া মিশাইয়া' মায়াতীতকে দেখিতে চাহে; কারণ 'মায়া মিশাইয়া' দেখা ছাড়া বিশ্বমানবের ও বিশ্বরূপের সাহজিকতা নাই। 'মায়া মিশাইয়া' দেখাই তাহার বিরূপের স্বভাবে সহজ হইয়াছে। মায়াতীতকে এইরূপ মায়া মিশাইয়া দেখিতে গেলেই চিৎ-অচিৎ-মিশ্রবাদ বা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ মনীষাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ অনাদি মায়ার একটী প্রভাবরূপে চিরকালই বিশ্বে ও বিশ্বরূপে প্রচারিত আছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মধ্যে চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের খণ্ডন

এই চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের করাল-কবল হইতে গণসমষ্টিকে উদ্ধার করিয়া চিৎসমন্বয়ে সমন্বিত করিবার জন্য যুগে যুগে ভগবান্, ভাগবতগণ ও ভাগবত-শাস্ত্র অবতীর্ণ হন। যখন অর্জ্জুন মানব-মনীষার প্রাথমিক আরোহ-অবস্থাগত অভিনয় দেখাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

"**দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।**
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥" (গীঃ ১।৪২)

অর্থাৎ, 'এইপ্রকারে বর্ণসঙ্কর-সৃষ্টিকারী কুলনাশকগণের দোষে শাশ্বত কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম সব উৎসন্ন হইয়া যায়'—প্রভৃতি বাক্যে অর্জ্জুন দেহনিষ্ঠ-

জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মকে আত্মনিষ্ঠ শাশ্বত-ধর্ম্মের সহিত সমন্বয় এবং সেই চিজ্জড়-সমন্বয়ের মধ্যে আবার পাণ্ডিত্যসূচক তর্ক উঠাইয়া চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদকে সমর্থন করিবার চেষ্টার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখনই ভগবান্ বলিলেন—

"**অশোচ্যানান্যশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে**" (গীঃ ২।১১);
"**অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো**
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" (গীঃ ২।২০)

অর্থাৎ 'হে অর্জ্জুন, তুমি পণ্ডিতগণের ন্যায় কথা বলিতেছ, অথচ যাহা শোকের বিষয় নহে, তাহাতে শোক করিতেছ।' 'জানিয়া রাখ, শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না; আত্মা—জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ (রূপান্তরহীন)।' এইরূপে প্রভৃতি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ অচিৎকে চিৎ এর সহিত সঙ্করিত বা সমন্বিত করিবার বহির্ম্মুখিণী মানব-মনীষার চেষ্টায় আঘাত করিয়াছিলেন। চিৎ ও অচিৎ-এ সমন্বয়ই বর্ণসঙ্কর; তথাকথিত সমন্বয়বাদ এই বর্ণসঙ্কর-দোষেই দুষ্ট। নির্ম্মলা আত্মধর্ম্ম-ভক্তির সহিত বদ্ধদশা-কবলিত জীবের কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টাকে মিশ্রিত বা একাকার করা অথবা পরাৎপর বিভূচেতনের সহিত কর্ম্মফল-বাধ্য ক্ষুদ্র চেতনকে একাকার করা কিংবা অদ্বয় পরমেশ্বর-বস্তুর সহিত নশ্বর বস্তুর একাকার করিবার চেষ্টাই বর্ণসঙ্কর বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ। জীবের এইরূপ বর্ণসাঙ্কর্য্য-পিপাসা বা চিজ্জড়সমন্বয়-তৃষ্ণাকে ক্রমে ক্রমে নিবারিত করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রবৃত্তি এবং "**সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**"—চরম শ্লোকে তাহার সমাধান। সর্ব্বপ্রকার চিৎ-অচিৎ-বৃত্তি মিশ্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণচেতনে প্রপত্তিই অর্থাৎ নির্ম্মলা চিদ্‌বৃত্তিতে অবস্থানই—সমন্বয়। অচেতনের সহিত চেতনের সঙ্গতি হইতে পারে না। ভক্তির সহিত ভক্তি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের কখনই সমন্বয় হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ খণ্ডন

শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশ-লীলায় "খড় ও জাঠিয়া বেটা" মুকুন্দের প্রতি যে ব্যবহার-অভিনয়ের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদকে

নিরাস করিয়াছে। মহাপ্রভুর ভাষায় চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছেন,—

"ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
খড় ও জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে,—ও বেটা যখন যথা যায়।
সেমত কথা কহি,—তথাই মিশায়॥"

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ কখনও পূর্ণচৈতন্যরূপ ভগবানের দর্শন পায় না। তাহারা একদিকে দন্তে খড় ও তৃণ লইয়া 'তৃণাদপি সুনীচতা'র অভিনয় দেখায়, অপরদিকে হস্তে যষ্টি লইয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে অর্থাৎ পায়ে হাত ও গলাটিপা —এই দুইটী বিরুদ্ধ ব্যাপারে গোঁজামিল দিবার প্রয়াস করে। কর্ম্মের অহমিকা ও ভক্তির শরণাগতির কখনই সমন্বয় হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত যে মহাচিৎ-সমন্বয়বাদের কথা প্রচার করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনুগ-গণের মহাভাগবত-জীবনে সেই মহাচিৎ-সমন্বয় পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। এই মহাচিৎসমন্বয় শ্রীনৃসিংহ-উপাসক শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আদি-বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীধর-স্বামিচরণের চিৎসমন্বয়কেও অধিকতর প্রস্ফুটিত ও প্রফুল্লিত করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের উপাদানের এরূপ উপযোগিতা যে, তাহাতে খাঁটি অপেক্ষা ভেজাল, আসল অপেক্ষা মেকিই অধিকতর 'খাপ খায়'। কাজেই চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদেরই অধিকতর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন গণ-সমষ্টির মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যদেবের মহাচিৎ-সমন্বয়বাদ স্থাপন

এই চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের নির্ব্বিশেষ লক্ষ্য 'কালাপানি'র অতল সমাধি হইতে গণগড্ডলিকাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যের মহাচিৎ-সমন্বয়বাদের আলোকস্তম্ভ নগরে-নগরে, গ্রামে গ্রামে, দেশে-বিদেশে প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন। মহাচিৎসমন্বয়বাদে পূর্ণচেতনের সহিত যেমন অণুচেতনের অন্বয়ভাবে সম্যক্ অন্বয় আছে, আবার তেমনি পূর্ণচেতনের অচিৎশক্তি-পরিণত বিশ্বের সহিত ব্যতিরেকভাবে অন্বয় রহিয়াছে। পরম শক্তিমানের সহিত চিৎশক্তির যেরূপ 'অন্বয়-ভাবে' সম্যক্ অন্বয়, অচিৎশক্তির

সহিত 'ব্যতিরেক-ভাবে' তেমনি অন্বয়। অন্বয়-মুখে অন্বয় ও ব্যতিরেক-মুখে অন্বয় ত্রিপাদ-বিভূতিকে, গোলোক ও ভূলোককে এক অনির্ব্বচনীয় মহা ঐক্যতানের সূত্রে সজ্জিত করিয়া মহাসমন্বয়ের মহাসৌধ রচনা করিয়াছে।✶ সেই সমন্বয়-সৌধের সৌন্দর্য্য আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে মুক্তপ্রগ্রহ-স্বরূপে দেখিতে পাই। প্রভুপাদের এই সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়ের উত্তেজনা দ্বারা গণগড্ডালিকাকে তাহার প্রেয়ো-রুচিতে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত করিয়া চরমে চিরতরে নির্ব্বিশেষ বা জড়বিশেষ যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদান করে না; পরন্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে নিখিল গণের সমগ্রতা গণেশেশ্বরে কেন্দ্রীভূত করিয়া অনন্ত মহাসমন্বিত বাস্তব জীবনে জীবনীসঞ্চার করিয়া দেয়। তথাকথিত সমন্বয়বাদের মধ্যে যে কতটা গোঁজামিল, কপটতা, গুপ্ত-লোকঠকান-প্রবৃত্তি, একদেশী অপসাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বর্ত্তমান, তাহা বর্ত্তমানযুগকে শ্রীল প্রভুপাদ ভাবিবার অবসর দিয়াছেন। তথাকথিত সমন্বয়-বাদের যে বিশ্ব-গ্রাসিনী মাদকতা গণগোষ্ঠীর চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই বিরাট্ নেশার সংক্রামকতা হইতে উদ্ধার করিবার শক্তি একমাত্র প্রভুপাদেই আমরা দেদীপ্যমান দেখিতে পাই।

✶ এইসকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ণচেতন মূলবস্তু শ্রীকৃষ্ণেরই চিৎশক্তি হইতে সমগ্র চিৎজগৎ (ত্রিপাদ বিভূতি) ও অচিৎশক্তি হইতে সমগ্র অচিৎজগৎ (এক পাদ বিভূতি) প্রকাশিত। চিৎজগৎ 'চিৎ'-বস্তু ও নিত্য বলিয়া পূর্ণচেতন মূলবস্তুর সহিত সাক্ষাদ্ভাবে সম্বন্ধিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবোপকরণ। অপরদিকে অচিৎ-জগৎ জড় ও অনিত্য বলিয়া পূর্ণচেতন মূলবস্তুর সহিত সাক্ষাদ্ভাবে সম্বন্ধিত নহে, কিন্তু সেই মূলবস্তুরই অচিৎশক্তি-জাত বলিয়া পরোক্ষ-ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং এই অচিৎজগতের অন্তর্গত বস্তুসকল সাক্ষাৎরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ নহে বটে, তাই বলিয়া এ-জগদ্বাসিগণের ভোগোপকরণ নহে বা ত্যাগোপকরণও নহে। এস্থলে প্রভুপাদ শ্রুতি-কথিত "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" (ঈশ উপঃ১) মন্ত্র-অনুসারে জানাইয়াছেন—"**আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়-সমূহ সকলি মাধব।**" অর্থাৎ, ভোগাসক্তি-রহিত হইয়া 'আমি কৃষ্ণদাস' জানিয়া কেবল ভগবৎ-সম্বন্ধেই মাত্র জগদ্দর্শন হইলে "**গৃহেতে গোলোক ভায়**"। ইহাই 'মহাচিৎ-সমন্বয়'।

ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অধর্ম্মেরই মতবাদ—চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ

তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারক, স্বয়ং সিদ্ধ বা গণসিদ্ধ আচার্য্য, অবতার প্রভৃতি কেহই এই সংক্রামক চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আজকাল কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি—সর্ব্বত্রই সমন্বয়বাদের ধূয়া উঠিয়াছে। লৌকিক ধর্ম্ম, লৌকিক সমাজ, লৌকিক রাজনীতি, অর্থনীতিতে অর্থাৎ জড়ের ব্যাপারে জড়ের কথা থাকে থাকুক; কিন্তু সনাতনত্বের দোহাই দিয়া যদি জড়ের ব্যাপার ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে উহাতে আর একটি নূতন অপসাম্প্রদায়িকতা বা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ আসিয়া পড়িল। ক্রমে সেই চিজ্জড়-সমন্বয়ের পরম্পরা বা শৃঙ্খল প্রসারিত হইতে হইতে গণগড্ডলিকাকে চতুর্দ্দিকে বন্ধন করিয়া মহা অতলসাগরে নিমজ্জিত করিবেই করিবে।

প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক এক উদাহরণ-দ্বারা সমন্বয়-বাদের নিরাকরণ

শ্রীল প্রভুপাদ একটী গল্পের অবতারণা করিয়া বলেন,—কোন মাঝী নৌকার গুণ টানিতে টানিতে বিচার করিয়াছিল যে, কণ্টকাকীর্ণ পথে গুণটানাকালে তাহার পদদেশ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, সুতরাং সে কিছু ধন সংগ্রহ করিতে পারিলে যে-যে-স্থান দিয়া তাহার গুণ টানিতে হইবে, সেইসকল স্থানে লেপ-তোষক প্রভৃতি বিছাইয়া রাখিবে এবং সেই সুকোমল-দ্রব্যাস্তীর্ণ-পথে বিচরণ করিয়া সে আরামের সহিত গুণ টানিতে পারিবে। মূর্খ মাঝী বুঝিল না যে, প্রচুর লেপ-তোষক সংগ্রহ করিবার মত অর্থ হইলে তাহার আর গুণ টানিবারই প্রয়োজন থাকিবে না। মাঝী তাহার নির্ধন-অবস্থার কথা যেরূপ ধন-প্রাপ্তির পরেও ব্যাপ্ত করিতে চাহিয়াছিল, তদ্রূপ কপটতা ও লোকপ্রিয়তা-রূপ লৌকিক-ধর্ম্ম, লৌকিক সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিতে যে গণভজন-মতবাদরূপ সমন্বয়বাদ স্বাভাবিক, সেইরূপ সমন্বয়বাদ নির্ম্মল চেতন-বৃত্তির রাজ্যে অর্থাৎ সনাতনধর্ম্মে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। সনাতন থাকিবে যাবতীয় অসনাতন বা দেহ-মনোধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট। ব্যতিরেকভাবে তাহার সহিত অন্বয় হইলেও অন্বয়মুখে সনাতনের সহিত অসনাতনের অন্বয় নাই। এইরূপ অচিৎ-এর সহিত চিৎ-এর ব্যতিরেকভাবে অন্বয় ও চিৎ-এর সহিত চিৎ-এর অন্বয়মুখে অন্বয়ই—সমন্বয়। অপরদিকে অচিৎ-এর সহিত চিৎ-এর অন্বয়—অসমন্বয়।

প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিরও ভক্তির সহিত সমন্বয়ের সন্ধান প্রদান

শ্রীল প্রভুপাদ এই অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখি সমন্বয়-সিদ্ধান্ত বাস্তব-ক্ষেত্রে শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, এমনকি অন্যাভিলাষের পর্য্যন্ত ভক্তির সহিত সমন্বয়ের সন্ধান দিয়াছেন। অন্যাভিলাষী তাহার অন্যাভিলাষগুলিকে পুণ্যাভিলাষ বা শূন্যাভিলাষে অস্বাভাবিকভাবে সমন্বিত করিবার পণ্ডপরিশ্রম-চেষ্টা দেখাইয়া যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবাহন করে, তাহা তাহাকে শূন্যের প্রহেলিকায় আত্মহত্যা করায়; কিন্তু সেই অন্যাভিলাষ যদি কৃষ্ণাভিলাষের আনুকূল্যের পথে কলে-কৌশলেও নিযুক্ত হইতে পারে—সমন্বয়ের প্রত্যক্ (অন্তর্ম্মুখ) পথে মুখ ফিরাইতে পারে, তাহা হইলে অন্যাভিলাষিতা পরিত্যক্ত হইয়া কৃষ্ণাভিলাষে সমন্বিত হইয়া পড়ে। প্রভুপাদ আমাদের বিবিধ অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাগ্রহিতা, জ্ঞানাগ্রহিতা, তপস্যাগ্রহিতা ও যোগাগ্রহিতাকে সর্ব্বসমন্বয়ের লক্ষ্যবস্তু আদিপুরুষ গোবিন্দের ও গোবিন্দ-গণের দিক্-অভিমুখী করিবার জন্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান, বিবিধ কার্য্য-প্রেরণা ও বিভিন্ন অবকাশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা গৌড়ীয় বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণ তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

(৭)

প্রভুপাদ ও দেশ-প্রেম

'দেশপ্রেম'-শিক্ষার কুফল—দেশে দেশে সঙ্ঘর্ষ

আজকাল সভ্যতাদেবীর কৃপায় মানুষের বুকে দেশ-প্রেমের কিছু অভাব নাই। যে-যে-দেশে অসভ্যতাদেবীর আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল বা আছে, সে-সে-দেশের জীব-জন্তুরও হৃদয়ে দেশ-প্রেমিকতার উত্তপ্ত শোণিত যে কিছু কম আছে, তাহাও নহে, তবে সভ্যতাদেবী তাঁহার সন্তানগণের উপর একটা মনোমুগ্ধকারী বিশ্ব-আকর্ষী প্রলেপ দিয়াছে, এইমাত্র তফাৎ। এই সভ্যতাদেবীর দেশপ্রেমিক সন্তানগণের মধ্যে অনেক মনীষির আধুনিক অভিমত এই যে, তাঁহারা নাকি 'দেশপ্রেম' পূর্ব্বে শিক্ষা দিয়া ভুল করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, যদি মানবকে অগ্রে 'বিশ্বপ্রেম' শিক্ষা দেওয়া যাইত, তাহা হইলে দেশপ্রেম তদন্তর্ভুক্ত হইয়াই মানব-হৃদয়ে অবস্থিত থাকিত। তাঁহারা আরও বলেন,—'বিশ্বপ্রেম' শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে 'দেশপ্রেম' শিক্ষা দেওয়ায় পরস্পরের মধ্যে যে জাতীয় সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল বড় ভয়াবহ। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, অহিংস্য-নীতির অস্ত্রোপচারও সেই কুফলের স্ফোটককে (ফোড়াকে) নির্ম্মূলভাবে ছেদন করিতে পারিবে না।

তথাকথিত 'বিশ্বপ্রেম'ও নিতান্তই কাল্পনিক

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে এ সকল ভাবী বিপদ দর্শন করিবার পূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং সেই দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেই দেশপ্রেমিক মনীষিগণের বিশ্বপ্রেমের সৌধের ভিত্তিও যে অবলোকন করিবার আমাদের পূর্ব্ব-সুযোগ না হইতেছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় ন। এই বিশ্বপ্রেমের ভিত্তি দেশপ্রেমের ভিত্তির উপাদান হইতে পৃথক্ নহে। যেখানে পরস্পরের স্বার্থ ভিন্নমুখী, সেখানে কেবল দৈহিক জাতীয়তা ও মৌখিক উদারতার প্রলেপ কি করিয়া অপস্বার্থকে প্রেম বা প্রীতির উপাদানরূপে পরিণত করিবে? প্রেমের উপাদানে স্বার্থের গতি

ভিন্নমুখিনী নহে। প্রেমের উপাদানে প্রেমাস্পদের বহুত্ব নাই, প্রেমিকের বহুত্ব আছে।

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণের কল্পিত বিশ্বপ্রেমের ছড়াগান

তবে এখানে আবার এই প্রেমের উপাদানের আনুকরণিক একপ্রকার মেকি মাল বিশ্বপ্রেমের একটা মনোহারী প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে। "*বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।*"—এই যে প্রেমের বহু আস্পদের আস্পর্দ্ধা লইয়া বিশ্বপ্রেমের প্রতীক গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বহুর প্রতীককে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-সাগরের জলে বিসর্জ্জনের পর একত্বের একটা কল্পনা বিশ্বপ্রেমের আদর্শ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, সেই আদর্শটী আমাদের সমালোচিত পূর্ব্বোক্ত চিজ্জড়-সমন্বয়বাদেরই একটা স্বপ্নলব্ধ বিভূতি। এই স্বপ্নলব্ধ বিভূতি গণসমষ্টির কামনা পূরণ করিবে—এই আশায় ইহার গ্রাহক-সংখ্যার অভাব নাই।

'জীবে প্রেম' কথার অবাস্তবতা

কিন্তু স্বপ্নলব্ধ জিনিষ বা কোন বিভূতি কেবল গতানুগতিকতার মোহে উত্তেজিত হইয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা আত্মস্থ হইয়া উহার স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিব। প্রথমতঃ 'জীবপ্রেম' কথাটী সিদ্ধ হয় কি না? প্রেমাস্পদ যাহা চায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে সাধন করার নামই প্রীতি এবং তাহাই প্রেমিকের সমগ্র স্বার্থ। প্রেমাস্পদের অভীষ্ট পরিপূর্ত্তিতে প্রেমিকের স্বার্থ সমগ্রতা-প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে 'প্রেম' বলা যায় না। প্রেমিকাভিমানীর যদি কিছু পৃথক্ স্বার্থের তহবিল থাকে, তাহা হইলে মৌখিক প্রেমিকতার ফল্গুত্ব এবং তন্মধ্যে কামের পঁচা বদ্ধজল আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু বাহিরে মৌখিকতা ঐ কামের পঁচা রুদ্ধ ভাবকে এরূপ চাক্‌চিক্যময় প্রলেপ দিয়া রাখে যে, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না। বিমুখ জীব যাহা চায়, বিমুখ জীবের যাহা প্রেয়ঃ (সুখকর), তাহা সর্ব্বতোভাবে সরবরাহ করার অর্থাৎ প্রেয়ের প্রশ্রয় দেওয়াই যদি 'জীবপ্রেম' নামে বাজারে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে সেখানে ছলনা হইল না কি? তাহা হইলে 'জীবপ্রেম' কথাটী অস্বাভাবিক, তৎপরিবর্ত্তে 'জীবের কামের ইন্ধন' কথাটীই যেন নির্ভীক নিরপেক্ষতা ও সরলতার পরিচয় প্রদান করে।

'প্রেম'- শব্দের তাৎপর্য্য একমাত্র পরমেশ্বরের প্রীতিবিধান

'প্রেম' একমাত্র পরমেশ্বরেই প্রযুক্ত, কারণ সেখানে বহু নাই,—'*বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?*'—এরূপ প্রেমের বিরোধী সাময়িক উত্তেজনাপর বাগ্‌বৈখরীর ছলনা নাই। পরমেশ্বরের প্রেয়ঃ-সন্ধানই জীবের চরম শ্রেয়ঃ, আর জীবের প্রেয়ঃ-সংগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অ-শ্রেয়ঃ—ইহাই উপনিষদে✶ নচিকেতার প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই। পরমেশ্বরের প্রেমের ইন্ধন হওয়াই যেখানে সমগ্র-সার্থকতা, সেখানেই প্রেমের অবকাশ, আর যাঁহাদের সেই পরমেশ্বরের প্রেমের ইন্ধন-সংগ্রহে সমগ্রতা সমন্বিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রেয়ঃ-সংগ্রহও প্রেম। এরূপ প্রেমই বিশ্বকে পূর্ণসুখের আধার করিতে পারে।

অনিত্য বিশ্বে নিত্য 'প্রেম-তত্ত্ব' অসম্ভব, আছে কেবল কামচরিতার্থতা

কিন্তু যে-বিশ্ব বিমুখতার উপাদান দ্বারা গঠিত—যে-বিশ্ব বিমুখতার দণ্ডগৃহ সদৃশ—যে-বিশ্ব বিমুখজীবে পরিব্যাপ্ত—যে-বিশ্ব বিমুখ-বিমোহিনী মায়ার প্রভাব- পরিণতি মাত্র—যে-বিশ্বে প্রত্যেকের ভিন্নগামী স্বার্থ—যে বিশ্বের প্রীতিই 'কাম'—উপনিষদের উক্তিতে§ বলিতে গেলে, যে-বিশ্বে মাতা পুত্রকে স্বীয় কামচরিতার্থের জন্যই স্নেহচুম্বন করিয়া থাকে, পুত্র স্বীয় ইন্দ্রিয়গত কামনার তৃপ্তির জন্যই মাতাকে ভালবাসে—যে বিশ্বের 'দেশ-প্রেমিকতা'

✶ "**শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥**" (কঠ উঃ) অর্থাৎ, 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ'—এই উভয়ই মনুষ্যের আয়ত্তাধীন। ধীর ব্যক্তি এই উভয়ের সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিয়া উভয়ের পার্থক্য নিরূপণ করেন (অর্থাৎ দেখিতে পান যে, শ্রেয়ঃ—মুক্তির কারণ, এবং প্রেয়ঃ—বন্ধনের কারণ)। তজ্জন্য ধীর ব্যক্তি শ্রেয়ঃকে বরণ করেন আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তি—'যোগক্ষেম'-বিচারপর প্রেয়ঃ (যোগ—অলব্ধ বস্তুর লাভ, ক্ষেম—লব্ধ বস্তুর রক্ষা)।

§ "**ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি---ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি**" ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক উঃ)

মাটীকে কেন্দ্র করিয়া বা জাতীয়তা-মাটীরই দ্বিতীয়স্বরূপ দেহকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অবস্থিত, সে বিশ্বে কাম ব্যতীত প্রেমের অবকাশ নির্ভীক নিরপেক্ষ বিচারে আছে কি?

অনিত্য বিশ্বে নিত্যতত্ত্ব 'প্রেম' অসম্ভব

প্রেমাস্পদ—নিত্য; কিন্তু বিশ্ব কি প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের ন্যায় নিত্য? সবিশেষ-বাদিগণ বিশ্বকে সত্য বলিলেও 'অনিত্য' বলেন, আর নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ ত' বিশ্বকে 'মিথ্যা' বলিয়াই উড়াইয়া দেন; সুতরাং কাহারও মতেই ত' বিশ্ব 'নিত্য' নয়। তবে বিশ্বপ্রেম কিরূপে সম্ভব? আর অনিত্য বিষয় লইয়া যদি প্রেম হয়, তাহা হইলে আমরা কি পৌত্তলিক (পুতুল-পূজক) নহি? অবুঝ শিশু মাটীর পুতুল লইয়া তাহার সঙ্গে যে-প্রেমের ছলনা করে, তাহাই কি সভ্য, সুশিক্ষিত, প্রবীণ, জ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক আমাদের উপাস্য হইবে? পচা মড়াকে লইয়া কি প্রেম হয়? অনিত্যকে লইয়া কিরূপে প্রেম হইতে পারে? উহা ত' প্রেমের অভাব।

বিশ্ব-মানবের প্রেম-দর্শনে পশুজাতির কটাক্ষ

আর মায়াবাদী—চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর প্রতিজ্ঞাই যেস্থলে 'রজ্জুতে সর্পভ্রমের' ন্যায় এই জগৎ বিবর্ত্তমাত্র, সেস্থলে সেইরূপ বিবর্ত্তের প্রতি অর্থাৎ সর্পাকার জগৎ ও জগদ্বাসীর প্রতি প্রীতিই বা কিরূপে 'প্রেম'-পদবাচ্য হইতে পারে? মহামানব-মনীষা কি নিরপেক্ষ নির্ভীকভাবে এইসকল বিচার করিবে না? যদি সর্ব্বোচ্চ বিচার-পরায়ণ মানব নিরপেক্ষ নির্ভীক বিচারে পশ্চাৎপদ হন, তবে পশুগণ কি বলিবে? পশুগণ কি তখন বাক্‌শক্তি সংগ্রহ করিয়া বলিবে না,—আমরাও তো কামের বশীভূত হইয়া জাতীয়তা করি, সামাজিকতা করি, অপস্বার্থের বশীভূত হইয়া পরস্পর প্রীতি করি, ইহাই কি মানবেরও প্রেমের আদর্শ? মানব কি কোন অসমোর্দ্ধ্ব পরাৎপর নিত্য প্রেমের আস্পদ খুঁজিয়া পাইল না? প্রেম চেতনের স্বভাব বটে, সমন্বয়ও চেতনের স্বভাব বটে, কিন্তু অনিত্যে—অচেতনে যদি তাহা কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে তাহা কি প্রেম? ছায়া কি বাস্তব বস্তু?

শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক বিশ্বমানবকে যথার্থ প্রেম-মার্গ প্রদর্শন

প্রেমের প্রতিফলনকে 'প্রেম' মনে করিয়া যে বিশ্ব-মানব সংক্রামক বিরাট্ বিবর্ত্ত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্ববৈষ্ণব-প্রেম প্রচার করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপ-সনাতন-শাসিত বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—বিশ্বপ্রেমের নামে কামের পথে চলিও না; কিন্তু অপ্রাকৃত কামদেবের কামাগ্নির ইন্ধনে যাহারা স্বার্থের সমগ্রতাকে আত্মসাৎ করাইয়াছেন, সেই বিশ্ববৈষ্ণবে প্রেম কর। তাহা হইলে তোমার স্বরূপের দেশের প্রতি প্রেম, স্বরূপের জাতীয়তার প্রতি প্রেম এবং সমগ্র জীবের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে। জীবের নৈমিত্তিক বহির্ম্মুখতা যাহা চায়, তাহার সরবরাহ না করিয়া জীবের নিত্য উন্মুখতা যাহা যায়, তোমরা তাহার সরবরাহ কর। জীবের নিত্য উন্মুখতা চায়,—তাহার স্বরূপের দেশে যাইতে—তাহার স্বরূপের প্রেমাস্পদকে পাইতে—তাহার স্বরূপের পূর্ণস্বাধীনতাকে লাভ করিতে। তোমরা নিজে আচরণ করিয়া সেই বিশ্ববৈষ্ণব-প্রেমের বার্ত্তা প্রচার কর। তাহা হইলে যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রীতি বা প্রেমের নিদর্শনগুলি তদন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে এবং তখন সমগ্র বিশ্ব সমসুরে বলিতে পারিবে,—

"বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে"।

(৮)

প্রভুপাদ ও 'অ্যাপথিওসিস্'

দেবতাগণের সহিত প্রতিযোগিতা-মূলে অসুরগণ-দ্বারা 'দেবতা'-কল্পনা

'অ্যাপথিওসিস্' বা মনুষ্যে দেবারোপ-কল্পনা-বাদ বর্ত্তমান যুগের অথবা অনাদি-বহির্ম্মুখ সর্ব্বযুগের একটা নৈতিক বা অতিনৈতিক ধর্ম্মোন্মাদনার প্রতীক। এই অ্যাপথিওসিস্ বহুরূপী হইয়া মানব-মনীষার কল্পনাকে ক্রীড়নক করিয়াছে। নায়কপূজা, বীর-পূজার গণ্ডী 'অতিবাড়ী' হইয়া অ্যাপথিওসিসে আরোহণ করিয়াছে। সুরগণের সহিত অসুরগণের অবৈধ প্রতিযোগিতা করিবার আনুকরণিক মনোভাব হইতে এই অ্যাপথিওসিস্ উদিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ—নব্য অবতারবাদের উর্ব্বর-ভূমি

এই অ্যাপথিওসিস্ সকল দেশেই ন্যূনাধিক প্রচলিত থাকিলেও ধর্ম্মোন্মাদনার সুলভক্ষেত্র, বিশেষতঃ অতিসুলভক্ষেত্র বাঙ্গালার ভাবপ্রবণ জল-মাটিতে অতি সহজে ও সাদরে সংক্রামিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন নব্য অবতার-বাদের আখ্‌ড়া-গুলিতে এই 'অ্যাপথিওসিস্-দেবতা'রই প্রতীক পূজা হয়। বঙ্গদেশে ইহার মৌলিকত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্বের আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণাবতারিত্বের আনুকরণিক প্রতিযোগিতায়ও 'পৌণ্ড্রক-বাসুদেবে'র শৃগাল- মনোভাব-জাত অ্যাপথিওসিস্ এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল। এক বাঙ্গালায়ই কত গণ্ডায় গণ্ডায় 'কিষ্ট-বিষ্টু'-সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীতে তাহার সুমারী হওয়া সুকঠিন। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে 'পৌণ্ড্রক বাসুদেবে'র প্রসঙ্গে অ্যাপথিওসিস্-বাদের মস্তকে যে-লগুড়ের আঘাত দেখা যায়, সেই লগুড় শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্বের সময় বাহ্য যন্ত্রাকারে প্রাণ বিনাশ না করিয়া বাঙ্গালার আদি কবির মর্ম্মভেদী বাণী-বাণে পুনঃ প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি অতি সহজ ধর্ম্মোন্মাদনার জলমাটিতে আধুনিক যুগেও অনেকগুলি নব্য অবতারবাদের আখ্‌ড়া গজাইয়া উঠিয়াছে। এইসকল নব্য অবতার-বাদে কাহারও রাম-সাধনার ফলে বানর-রাজের ন্যায়

পশ্চাদ্দেশে লাঙ্গুল গজায়, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিবার কামুকতা জাগিয়া উঠে, কাহারও 'সখীভেকী'-সাধনার ফলে স্ত্রীধর্ম্ম প্রকাশ পায়, কাহারও কামিনী-কাঞ্চনে নিস্পৃহতার প্রমাণ-স্বরূপ নিদ্রাবস্থায় হস্তে টাকা স্পর্শ করিলে হস্ত বক্রভাব ধারণ করে, কাহারও হাসিতে কাশিতে সমাধি হয়, কাহারও পুরীষ-পরিত্যাগের পরিমাণগত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকার সাধনার সিদ্ধি-বিষয়ে প্রমাণ সূচনা করে, কেহ বা 'সব মতই সমান' প্রমাণ দেখাইবার জন্য পলাণ্ডু-ভক্ষণ, গোমাংস-গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানাঙ্গ আচরণ করিয়া 'সব অবতারের সেরা অবতার' বলিয়া প্রমাণিত হন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্য হইতেও দুই অঙ্গুলী বড় বলিয়া প্রচারিত হন, কেহ বা সুসজ্জিত খাদ্যরাশিকে নিষ্ঠীবন-প্রলিপ্ত করিয়া 'মহাকল্পতরু' নামে প্রচারিত হন, কেহ বা জড়বিজ্ঞানের দুই একটী 'কেরামতি' দেখাইয়া জগদ্‌গুরু হইয়া পড়েন, কেহ বা মনঃকল্পিত ছড়া সৃষ্টি করিয়া এবং ইন্দ্রিয়পরতার পথে লোককে প্রশ্রয় দিয়া একাধারে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হইয়া পড়েন, কেহ বা লাম্পট্যের প্রতিযোগিতা, কেহ বা ধূম্রপানের প্রতিযোগিতা, কেহ বা বিষ্ঠাভোজনের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি লইয়া অ্যাপথিওসিসের আখ্‌ড়ার আরাধ্যবস্তু হইয়া পড়েন।

"চোর বলে ঐ চোর"

আবার আরও আশ্চর্য্য যে, এইসকল আখ্‌ড়ার পাণ্ডাগণই বাস্তব স্থায়ী ভাবকে—ভাবপ্রবণতা, প্রকৃত চিৎসমন্বয়কে—গোঁড়ামি, সৎসিদ্ধান্তকে—'সাম্প্রদায়িকতা' প্রভৃতি প্রচার করিয়া তাহাদের অ্যাপ্‌থিওসিস্‌কেই উদার-নৈতিক, অসাম্প্রদায়িকতা বলিয়া স্থাপন করিতে চান। ইহাদের মনোভাব,—মানুষের প্রেয়ঃ রুচিকে শাসন করিবার জন্য যে শাস্ত্র বা সৎসিদ্ধান্ত, তাহাই সাম্প্রদায়িক। আমাদের প্রেয়ঃ (ইন্দ্রিয়সুখকর) রুচির পথের কণ্টককেই আমরা 'গোঁড়ামি' বলিতে চাই। আমার মন যাহা যায়, তাহা যদি সমর্থিত না হইল,

---

"চোর বলে ঐ চোর"—চোর ধরা পড়িয়া পলাইবার কালে সকলের ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য 'ঐ চোর' বলিতে বলিতে দৌড়াইতে থাকে। তাহাতে পথিকগণ প্রকৃত চোরকে বুঝিতে না পারিয়া অপর কাহাকেও 'চোর' বলিয়া ভ্রম করে।

তাহা হইলে সেখানে উদারতার লাঘবতা, গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া পড়িতে বাধ্য। আমার মনো-জাত কামুকতা ধর্ম্মের আকারে, কর্ম্মের আকারে, ত্যাগের আকারে, ভোগের আকারে, জাতিয়তার আকারে, দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেমিকতার আকারে, গুরুবরণ বা শিষ্যবরণের আকারে, ধ্যান-জপ-সমাধির আকারে, পরোপকারের আকারে, নীতি-দুর্নীতির আকারে—যে আকারেই আসুক না কেন, তাহাকে যাহা সমর্থন না করিবে, কিংবা শাসন ও সংযত করিবে, তাহাকেই 'সাম্প্রদায়িকতা' বা গোঁড়ামি বলিয়া আমরা আইন অমান্য করিব, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান যুগের মনোভাব।

শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক 'অ্যাপথিওসিসে'র মস্তকে লগুড়াঘাত

অদূরদর্শী, ভ্রম-প্রমাদযুক্ত, অপস্বার্থ-লুব্ধ জড়সম্প্রদায়ের আইন-অমান্যে যে উদারতার আমন্ত্রণ আছে, তাহা সুদূরদর্শী, ভ্রম-প্রমাদ-নির্ম্মুক্ত, প্রকৃত স্বার্থপ্রণোদিত ভাগবত-সম্প্রদায়ের আইনে বা স্বয়ং ভগবৎসৃষ্ট আইনে ব্যাপ্তি করিলে যে সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তিটী উৎপাটন হয় বা শ্রুতিমাতাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা দেখাইয়া দিতে গেলেও সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া-গানেরই পুনরাবৃত্তি হইয়া পড়ে। এইরূপ বহুরূপিণী নাস্তিকতা বা শ্রুতি-অমান্যকারিণী চেষ্টাই যে-বাজারে মহা আস্তিকতা ও বেদ-পথানুসরণ বলিয়া প্রচলিত, সেই বাজারে প্রকৃত সত্য কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ সম্পুট-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবিবার বিষয়। নায়ক-পূজা, বীর-পূজা, নব্য সৃষ্ট অবতার-পূজা, জাতি-পূজা, দেশমাতৃকা-পূজা, অর্থ-পূজা বা অনর্থ-পূজা, ইন্দ্রিয়-পূজা, নিরিন্দ্রিয়-পূজা, অন্য-পূজা, পুণ্য-পূজা, শূন্য-পূজা প্রভৃতি অ্যাপথিওসিসের বহুরূপ যে-যুগে বিশ্বমানব-মনীষাকে গ্রাস করিয়াছে, সেই যুগে শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র শ্রীচৈতন্য-চরণ-পূজা-প্রচার করিতেছেন। ইহা কত বড় জড়প্রতিষ্ঠা-বিসর্জ্জন ও কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠার অভিনন্দনের আদর্শ, তাহা বিচার করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তব শ্রীচৈতন্যচরণ-পূজার একায়ন প্রদর্শিত হওয়ায় সমগ্র বহির্ম্মুখ বিশ্বমানবের আরাধ্য 'অ্যাপথিওসিসে'র মস্তকে যে লগুড়াঘাত হইয়াছে, তাহাতে পীড়িত হইয়া গণ-পূজ্য প্রতীককে যদি 'শৃগাল বাসুদেবে'র ন্যায়

একটুকু চীৎকার করিয়া 'সোয়াস্তি' পাইবার অবসর ও অনুমতি পর্য্যন্ত না দেওয়া হয়, তাহা হইলে অ্যাপথিওসিস্‌কে যে গুমরাইয়া মরিতে হইবে! ''**প্রাণী-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে**''—এই বিচারে শ্রুতিমাতৃকার সন্তানগণ অ্যাপথিওসিসের বিশ্বপ্রতিষ্ঠাকে আত্মগ্লানি প্রশমনের অবসর দেন।

মনোধর্ম্মী বিশ্বমানবের জীবনের ত্রিসন্ধ্যায় তিন পূজা—অন্য-পূজা, পুণ্য-পূজা ও শূন্য-পূজা

বিশ্বমানব আমরা মানবধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মপর জীবনের ত্রিসন্ধ্যায় অন্য-পূজা, পুণ্য-পূজা ও শূন্য-পূজা—অ্যাপথিওসিস্ প্রতীকের এই তিনটী পূজা করিয়া থাকি। জীবনের প্রথম সন্ধ্যায় তরুণের মাদকতা লইয়া অন্য-পূজা করি, দ্বিতীয় সন্ধ্যায় প্রৌঢ়ত্ব স্বীকার করিয়া আমাদের অন্য-পূজার স্থানে অন্ন-পূজা পুণ্য-পূজার স্থলাভিষেক করে, তৃতীয় সন্ধ্যায় ধর্ম্মবিচার-জীবনের বার্দ্ধক্যে শূন্য-পূজাকে 'পূর্ণাহুতি' মনে করিয়া অ্যাপথিওসিস্ প্রতীকের বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাই। কিন্তু যে-কম্বল প্রাপ্তির লোভে জলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, সেই কম্বল আমার সুখের সাধক না হইয়া আমার আত্মবিনাশের সহায়ক হয়। কম্বলকে আমি বিসর্জ্জন দিতে চাহিলেও কম্বল আমাকে বিসর্জ্জন দেয় না। যে অচৈতন্য পৌত্তলিকতা আমাকে উহার আদি-পূজায় গ্রাস করিয়াছিল, মধ্য-পূজা ও অন্ত্য-পূজায়ও তাহাই অন্য মূর্ত্তিতে ঝাপটাইয়া ধরিয়া রাখে। কোনকালেই আমি অচৈতন্য ছাড়িতে পারি না। কেবল চিন্মাত্র-উপলব্ধির স্বপ্নসিদ্ধি-কালে ও অচিন্মাত্র বা অচৈতন্য মাত্রেরই একটা প্রচ্ছন্ন প্রহেলিকা আমাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে।

শ্রীল প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত ব্যাসপূজায় 'অ্যাপথিওসিসে'র মূলোৎপাটন

শ্রীল প্রভুপাদের ত্রৈকালিক শ্রীচৈতন্য-পূজা-প্রচারে এই ত্রৈকালিক অচৈতন্য-পূজা বা অ্যাপথিওসিস্-এর মূলোৎপাটিত হইতেছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে যাহারা খণ্ডবস্তু মনে করিয়া 'আমার গুরু', 'তোমার গুরু', 'যার যার গুরু, তার তার কাছে'—এইরূপ অ্যাপথিওসিসেরই অন্যপ্রকার অনর্থকে ধরিয়া রাখিতে চান, সেইরূপ 'মনুষ্যে দেবারোপ-কল্পনা-বাদ' হইতে উদ্ধার

করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম খণ্ড বা অ্যাপথিওসিসের প্রতীক নহেন, সেই অদ্বিতীয় পাদপদ্ম অদ্বয় পরিপূর্ণ পরম তত্ত্বের ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে পরিপূর্ণ অদ্বয়তত্ত্বেরই 'কাউণ্টার হোল'—'কাউণ্টার পার্ট' নহেন।✶ 'কাউণ্টার হোল' বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতাকে আক্রমণ করে না। যেখানে 'কাউণ্টার হোল' বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতাকে আক্রমণ করে, সেখানে আবার অ্যাপথিওসিস্ আসিয়া উপস্থিত হয়। নিরপেক্ষ সুধীগণ এই কথাগুলি খুব সহিষ্ণু হইলে ধরিতে পারিবেন। যিনি যতটা অকৃত্রিম নিরপেক্ষতার অভিনন্দন করিবেন, তিনি ততটা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের শোভা-দর্শনে সমর্থ হইবেন। নিরপেক্ষতাকে যেন কৃত্রিমতা ও অসহিষ্ণুতা আক্রমণ না করে, ইহাই প্রভুপাদের জীবন-ভাগবতের শিক্ষা।

✶ শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিপূর্ণ অদ্বয়তত্ত্বেরই 'কাউন্টার হোল', 'কাউন্টার পার্ট' নহেন—এস্থলে 'কাউন্টার হোল' বলিতে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণশক্তি বা পুরুষোত্তমেরই দ্বিতীয় বিগ্রহ লক্ষিত হইয়াছে। পুরুষোত্তমই তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার সহিত জীবজগতের নিকট দেখাইবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি ব্যক্ত করেন। সুতরাং সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম 'কাউন্টার পার্ট' নহেন অর্থাৎ কৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণশক্তির অংশবিশেষ অর্থাৎ আংশিক বা অপূর্ণশক্তি নহেন। 'কাউন্টার হোল' বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আশ্রয়বিগ্রহ ভগবান্, তিনি বিষয়বিগ্রহ ভগবানের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য জগতে প্রকাশ করেন, তৎপ্রতি আক্রমণ করেন না অর্থাৎ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনাম-রূপাদির ধ্বংসকারক কেবলাদ্বৈতবাদ আবাহন করেন না বা শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপরযুগীয় ভগবান্ বলিয়া কলিযুগে অচল ঘোষণা করিয়া নিজেকেই তৎস্থলাধিষ্ঠিত রূপে জাহির করেন না।

(৯)

প্রভুপাদ ও যুগমানবতা

অজ্ঞসমাজে—যুগধর্ম্মী ব্যক্তিরই তথাকথিত 'যুগমানবতা'

'যুগমানবতা' কথাটী আয়ত্ত করিতে হইলে যুগকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আধুনিক মনীষিগণের চিন্তাশীলতার ধারা এই যে, যুগকে বাদ দিয়া অথবা পারিপার্শ্বিকতাকে অবহেলা করিয়া ব্যক্তিত্ব সম্প্রকাশিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তিত্ব যুগকে যত গাঢ় আলিঙ্গন করে,—যে ব্যক্তিত্ব পারিপার্শ্বিকতার খাপে খাপে যত মিশিয়া যাইতে পারে, সেই ব্যক্তিত্বই তত যুগোচিত বা যুগধর্ম্মী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। যুগের ধ্যানের সহিত যে ব্যক্তিত্বের ধ্যান যতটা নির্ব্বিকল্প (ভেদরহিত), সেই ব্যক্তিত্বেরই ততটা যুগমানবতা। যুগমানবতাকে চরম সোপানে চালনা করিতে করিতেই যুগের যুগাচার্য্যত্ব, রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

সে-দিন আমরা 'যুগমানব' নামে একখানি পুস্তকে যুগমানবতার যে চেহারা দেখিতে পাইয়াছি, তাহার বুলিগুলি আহরণ করিয়া যুগমানবতার 'বিশ্বরূপ' সুধী জগৎকে অটুটভাবে দেখাইবার আমাদের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে ও সেরূপ যুগমানবতা যুগের সকলেরই আদর্শ নহে, এইরূপ প্রতিবাদের প্রস্তাব অনুমান করিয়া আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। তথাপি নিরপেক্ষ জগৎ বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ঐরূপ যুগমানবের বুলিগুলি যুগমনোভাবকে রূপ দিয়াছে এবং যাঁহারা ঐপ্রকার মনোভাবকে লোক-লজ্জা ভয়ে সরলভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ মনোভাবের কবল হইতে যে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ইহা যুগমানবতার বিশ্বরূপ কখনই প্রমাণ করে না।

কলিযুগে যুগধর্ম্মের দুইটী চিত্র—-
'সনাতন-ধর্ম্ম' প্রতি আক্রমণ ও সনাতন-ধর্ম্মী বলিয়া অভিনয়

একদিকে অতি নবীনগণের সনাতনের প্রতি আক্রমণ, আর একদিকে সনাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার ছলনা লইয়া সনাতনের অতিবাড়ী হইয়া পড়া অর্থাৎ কার্য্যত সনাতনকে লঙ্ঘন করিয়া সনাতনের খোসা ধরিয়া

টানাটানির মধ্যে যে ধর্ম্মোন্মত্ততা, এইরূপ দুইটী মনোভাবই বর্ত্তমান যুগকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। আপাত-প্রেয়ঃকে দেবতা করিয়া, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে সঙ্কল্পমন্ত্র করিয়া, গণমতকে পূজারী করিয়া, বিশ্বাসঘাতক প্রত্যক্ষকে অর্ঘ্য করিয়া জগতে যে যুগমনোভাবের প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই প্রতিমার পূজার জন্য আজ যুগের ঘরে ঘরে চণ্ডীমণ্ডপ রচিত হইয়াছে।

যুগমানবতার দুই রূপ—ভোগ-মানবতা ও ত্যাগ-মানবতা

যুগমানবকে সঙ্ক্ষেপ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে 'ভোগ-মানব' বলিতে হইবে। 'যুগমানব' আর 'যোগ-মানব' নাই। ভারতের চিরন্তন যোগ-মানবতারূপ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আজ ভোগ-মানবতা। এই ভোগ-মানবতা যখন যুগমানবতার রূপে, সভ্যতার সুসজ্জিত চণ্ডীমণ্ডপে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া অতি বাড়িয়া উঠিয়াছে, তখন ভোগ-মানবতার একঘেয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণকে একটুকু বিরাম প্রদান ও শাণিত করিবার জন্য কপট ত্যাগ-মানবতার আসুরী সম্পৎ ভোগমানব-জগতের বিরাট্ চক্ষুকে ঝলসাইয়া দিয়াছে। ঐ ত্যাগ-মানবতার দৃপ্ত বিভূতি ভোগ-মানবতাকে আশ্চর্য্যান্বিত ও অবাক্ করিয়া যুগমানবতা বা যোগ-মানবতারূপে আত্মপ্রচার করিলেও ঐরূপ ত্যাগ-মানবতার আস্ফালন ও অহমিকা ভোগ-মানবতার উপর অতৃপ্ত আধিপত্যের ক্রোধময় ও রাগময় অভিব্যক্তি। ক্রোধের মধ্যে যে উচ্চকণ্ঠ ও বলদৃপ্তভাব প্রকাশিত হয়, তাহা বল নহে; দুর্ব্বলতারই সাময়িক উত্তেজনা।

ত্যাগ-মানবতা—মহামানবতা নহে, ভোগ-পরায়ণতারই দ্বিতীয় রূপ

ভোগেন্দ্রিয়-তর্পণের বিরক্তিতে যে ত্যাগেন্দ্রিয়-তর্পণের আকাঙ্ক্ষা, জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের একঘেয়ে জীবনের পরে যে নিরিন্দ্রিয়-তর্পণে বিশ্রাম-লাভের বুভুক্ষা, 'পারিনগর' হইতে ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত উপভোগ করিবার বিরক্তির পর যে ''মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'' পরিবার পিপাসা, তাহা নিকষ-পাথরে পরীক্ষিত হইলে ভারতের 'যোগ-মানবতা' প্রমাণ না করিয়া 'ভোগ-মানবতা'র অতৃপ্ত লালসার উদ্গার কষই প্রকাশ করিয়া দেয়। ঐরূপ ত্যাগ-মানবতা কখনই ভারত বা মহাভারত-মানবতা

অথবা মহামানবতা হইতে পারে না। ক্রোধে মহামানবত্ব নাই,—আছে চণ্ডাল-মানবতা—অতি নীচ মানবতা। ভোগ-মানবতার প্রতি ক্রোধ-মনোভাবের মধ্যে যে-ত্যাগমানবতা যুগ-মানবতার রূপে আকারিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত মহামানবতার প্রতি মুখভঙ্গী মাত্র। সেরূপ মুখভঙ্গী বা মর্কট মনোভাবে যে যুগমানবতার আদর্শ সৃষ্ট হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া নাগরদোলার ন্যায় গতিশীলা।

ত্যাগ-মানবতা হইতে জাত আত্মত্যাগ বস্তুতঃ আসুরিক মনোভাব-বিশেষ

বর্ত্তমানযুগে যে দেহসর্ব্বস্বকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগ-মানবতার অস্ত্রে স্বদেশ-স্বাধীন-মানবতা বা মুক্তি-মানবতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস এবং ত্যাগ-মানবতার অত্যধিক উন্মত্ততায় অনশনব্রতে আত্মহত্যা, কিম্বা নিজের গলায় নিজে ছুরি বসাইয়া আত্মবিনাশের চেষ্টা, তাহা কখনই প্রকৃত আত্মত্যাগের আদর্শ হইতে পারে না; উহা আসুরী সম্পদের একটা অহমিকা এবং ভগবদ্-বিরোধ-মনোভাবেরই একটা বৈচিত্র্য। একলব্যের আত্মত্যাগের আদর্শে সেইরূপ ভগবদ্বিরোধ মনোভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নিরপেক্ষ-বিচারের বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের অভাবেই সেই ভগবদ্‌বিরোধ মনোভাব সুকুমার-মতি বালকগণের সাহিত্যেও 'গুরুভক্তি' নামে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমাজ ও সাহিত্যের এই গতিকে আমরা 'প্রগতি' বলিয়া আখ্যা প্রদান করি! এইরূপ তথাকথিত প্রগতি যে-যুগকে গ্রাস করে এবং যে-যুগ সেইরূপ যুগোচিত মনোভাবের ইন্ধন-সংগ্রহকারিগণকে 'যুগমানব' বলিয়া প্রচার করে, সেই যুগের যুগমানবতাকে অভিনন্দিত করিবার পূর্ব্বে সুধী জগৎ কি একবার নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিবেন না? রোগমানবতাই কি যোগমানবতা বা যুগমানবতা বলিয়া এই বৈজ্ঞানিকব্রুব-যুগে বিকাইবে?

যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা— যুগাবতারি-শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়ই প্রকৃত যুগমানবতা

শ্রীল প্রভুপাদ তথাকথিত যুগমানবতার উপাসকগণকে ইহা ভাবিবার অবসর দিয়াছেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী নরাকৃতি পরব্রহ্ম এই কলিযুগের

উপাস্য না হইলে তথাকথিত যুগমানবতার নামে ভোগ-রোগ-মানবতার রাজযক্ষ্মা সমাজদেহকে লম্ফ-গতিতে যে কিরূপভাবে দূষিত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-দর্পণে দেখিবার বিষয় হইয়াছে। যুগাবতারীর শ্রীচরণাশ্রয়ই নিখিল যুগমানবের মানবত্ব; তদ্বিপরীত যে-কোন প্রয়াস, অভিলাষ, আদর্শ—রোগমানবতার লক্ষণ, ইহা যেরূপ জোরের সহিত, প্রভাবের সহিত, প্রগতির সহিত, প্রাণময়তার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় প্রদর্শিত হইয়াছে, সেরূপ শিক্ষা কোন যুগের ভাগ্যে কোন কালে ঘটে নাই।

(১০)

প্রভুপাদ ও যুক্তবৈরাগ্য

শ্রীরূপ-কথিত 'যুক্তবৈরাগ্যে'র তাৎপর্য্য এক প্রভুপাদ-দ্বারাই জগতে প্রকাশিত

যুক্তবৈরাগ্যের কথা শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান অযুক্ত যুগকে যেরূপ চক্ষে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাহা অন্য কোনও যুগে কোনও আচার্য্য-কর্ত্তৃক এত স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু যুক্ত-বৈরাগ্যের সৌন্দর্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন।

তথাকথিত বৈরাগ্য বস্তুতঃ ভোগের অতৃপ্তি হইতেই জাত

সাধারণ পারমার্থিক জগতে কেবল একদেশী বৈরাগ্যের কথা প্রচারিত ছিল। আর সাধারণ লৌকিক ব্যক্তিগণও হয় স্থূল ভোগ, না হয় স্থূল ত্যাগের কথাই জানিত এবং তাহাকেই বহুমানন করিত। এজন্য সাধারণ ভোগি-সম্প্রদায়ের ন্যায় স্থূল ত্যাগিগণ বা ফল্গু ত্যাগিগণ ত্যাগের কসরত দেখাইয়া বড় বাহাদুর, সাধু, ধার্ম্মিক, মহাত্মা বলিয়া প্রচারিত হইত। কেহই বুঝিতে পারিত না, বা কাহারও বুঝিবার মত সুসূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ছিল না যে, ত্যাগ ভোগেরই আর একটা প্রকার মাত্র—অতৃপ্ত ভোগাসক্তিই ত্যাগ; ভোগের প্রতি ক্রোধান্ধতাই—ত্যাগ। "যদি ভোগ চিরকাল না-ই থাকিল—দূর ছাই, সেইরূপ ভোগ চাই না"—এইরূপ মনোভাব হইতেই ত্যাগ-প্রবৃত্তির উদয়।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভোগিমানবগণের দ্বারাই তথাকথিত বৈরাগ্যের বহুমানন

কি তথাকথিত পারমার্থিক সমাজ, কি আর্থিক সমাজ, যেখানেই যাওয়া যায়, সেখানেই যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ তত্তৎ সামাজিকগণের নিকট অভিনব ও আশ্চর্য্যকর মনে হয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই ন্যূনাধিক ধারণা,—জগতের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ ভোগী ও বিষয়ি-সম্প্রদায়ই ভোগ করিবে; ভগবান্ বা ভগবানের ভক্তগণেরই জন্য বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রতা ও উপবাসের ব্যবস্থা। যে-ব্যক্তি যত অধিক দিন নিরম্বু উপবাস করিতে পারেন, হিমালয়ের শৈত্য সহ্য করিতে

পারেন, তিনি তত বড় সাধু,—যে-ব্যক্তি অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি মহাত্মা, মৃত্যুঞ্জয়। এইরূপ বিচার ভোগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কারণ, জগতে যিনি যে- কার্য্যে অসমর্থ, তিনি অপর কাহাকেও তৎকার্য্যে সমর্থ দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হন, এবং ঐ ব্যক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করেন, ইহাই জগতের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। আমি নিজে এক মন পরিমাণের বোঝা উঠাইতে পারি না, আমি কোন বেগবান যানকে ধরিয়া রাখিতে পারিনা, যখন আমি কোন রাম-মূর্ত্তি বা শ্যাম-মূর্ত্তি নামধারীকে ৫০ মনের বোঝা উঠাইতে দেখি কিম্বা কোন বেগবান বৈদ্যুতিক বা বাষ্পীয় যান ধরিয়া রাখিতে দেখি, তখন তাহার শক্তির ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় মোহিত হইয়া পড়ি—আমার বুদ্ধি সেখানে অভিভূত হইয়া পড়ে—আমি সেরূপ শক্তিশালী পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বা মহান্ বলিয়া মনে করি। কিন্তু সুসূক্ষ্ম বিচার-তৌলদণ্ডে পরিমাণ করিলে দেখা যায়, ঐরূপ শক্তিশালী পুরুষ আমার যে ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধন-পূর্ব্বক তাহার ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় আমার মনীষাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার সার্ব্বদেশিকী শক্তির পরিচয় নাই, তাহাতে তাহার স্বরূপের পরিচয় আচ্ছন্ন। বাহ্য ঐশ্বর্য্য-ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া তাহার একদেশী প্রভাব-দ্বারা আমার সুসূক্ষ্ম-বিচার-পরায়ণতাকে যূপকাষ্ঠের অর্গলে আবদ্ধ করে।

অসুরগণেও দৃষ্ট হওয়ায় ফল্গুবৈরাগ্যের আসুরিকতা প্রমাণিত

ত্যাগের ভাণে—ত্যাগের ইন্দ্রজালে—ত্যাগের বাহ্য একদেশী ঐশ্বর্য্যে ত্যাগীর যথার্থ স্বরূপ আবৃত, আচ্ছন্ন। হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতির ভোগের ঐশ্বর্য্য ও ত্যাগের ঐশ্বর্য্য কোনটীই কম ছিল না। তাহারা ত্যাগৈশ্বর্য্যে যেরূপ দেবতাগণের চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়াছিল, দেবতাগণকে বিচলিত করিয়া দিয়াছিল, তাঁহাদের ভয়োৎপাদন করিয়াছিল, ভোগৈশ্বর্য্যেও রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি তেমনি দেবতাগণের বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক জগল্লক্ষ্মী বিষ্ণুশক্তিকে (?) পর্য্যন্ত স্পৃহা করিয়াছিল! রাবণ, হিরণ্যকশিপুর ত্যাগ-তপস্যা-বৈরাগ্য—ভোগ বা নির্ব্বিশেষ-গতিরূপ প্রচ্ছন্ন ভোগবিশেষ উত্তর-ফল লাভের জন্য। অসুরগণেও যখন ভোগ-বৃত্তির ন্যায় ফল্গু-ত্যাগ প্রভৃতি দেখা যায়, তখন

সেইরূপ ত্যাগের মূল্য কি? ফল্গু- ত্যাগ-প্রবৃত্তি ভগবদ্ভক্তি বা পারমার্থিকতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি। ভোগ যেরূপ ত্যাজ্য, ফল্গু-ত্যাগও সেইরূপ ত্যাজ্য; বরং ভোগ-প্রবৃত্তির বিরতি আছে, কিন্তু ফল্গুত্যাগ-প্রবৃত্তি সর্ব্বনাশকারিণী—তাহা ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিবার আস্পর্দ্ধা রাখে! রাবণের ত্যাগ—হিরণ্যকশিপুর ত্যাগ—একলব্যের ত্যাগ—গুরু-কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান মাত্র। ভোগ-পিশাচের কবল হইতে উদ্ধৃত হইয়া ত্যাগ-পিশাচের কবলে পতিত হওয়া সাধারণ অবিদ্বৎ-সমাজেরই 'ধার্ম্মিকতা', 'সাধুতা' প্রভৃতি।

স্বয়ং ভগবান্-কর্ত্তৃক তথাকথিত বৈরাগ্যের হেয়তা প্রদর্শন

কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুই আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"
"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

অর্থাৎ যে-কাল পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা বা ভোগ-ত্যাগ-বাসনারূপ পিশাচী-দ্বয় হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের উদ্ভব কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে। মুমুক্ষুগণ হরিসম্বন্ধি বস্তু-সমূহকেও প্রাপঞ্চিক নশ্বর মনে করিয়া ত্যাগ করিতে ধাবিত হয়, এজন্য তাহাদের ত্যাগ—ফল্গু ত্যাগ।

ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণসেবা—ভোগিগণের চক্ষে প্রাপঞ্চিক কার্য্যবিশেষ

সাধারণ ভোগোন্মুখ অবিদ্বৎ-সমাজ মনে করে, যেহতু জড় বস্তুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য সকলই অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক, ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যও সেই হেতু-মূলে প্রাপঞ্চিক এবং অনিত্য। তাহারা অনুমান-প্রমাণ বলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের, জড় ও চেতনের সমন্বয়বাদী। কাম—অনিত্য, প্রাপঞ্চিক বলিয়া তাহাদের বিচারে প্রেমও—অনিত্য, প্রাপঞ্চিক! অভক্তি ভোগ বা ত্যাগ অনিত্য বলিয়া ভক্তিও অনিত্য! অভক্তগণের খাওয়া-দাওয়া-থাকা বা কোন কার্য্য করা অনিত্য ব্যাপার, প্রাপঞ্চিক

বলিয়া ভক্তগণের আচরিত অনুষ্ঠান-সমূহও—প্রাপঞ্চিক! অভক্ত, বিষয়ী, ভোগী যে পুষ্প চয়ন করে, দ্রব্য আহরণ করে, অর্থ সংগ্রহ করে, বিষয়-চেষ্টা করে, গাড়ী-ঘোড়ায় আরোহণ করে,—তাহা যেহেতু প্রাপঞ্চিক, ভগবদ্ভক্ত একান্ত কৃষ্ণসেবার জন্য যে পুষ্প-চয়ন, দ্রব্য-আহরণ, অর্থ-সংগ্রহ বা সঞ্চয়, বিষয়-চেষ্টা ও দোলা-রথাদি আরোহণ করেন, তাহাও তদ্রূপই প্রাপঞ্চিক বিষয়-ভোগ মাত্র। ফল্গু-ত্যাগীর বিচারে—বিষয়ের বাহ্য-সংস্পর্শ-ত্যাগই সাধুতার লক্ষণ। কিন্তু উহা যে অতৃপ্ত, প্রচ্ছন্ন, বিষয়াসক্তির উন্মাদনা, তাহা তাহার প্রতারিত বুদ্ধিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না।

অজ্ঞ ত্যাগপন্থীগণের দ্বারা ভগবান্ ও ভগবৎপরিকরগণেও দোষারোপ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর দ্বারা এই সকল কথা প্রচার করাইলেও বহির্ম্মুখ মানব-সমাজ সেবোন্মুখী বুদ্ধির অভাবে ঐ সুসূক্ষ্ম সেবা-প্রাণময় বিচার বিস্মৃত হইয়াছিল—মৎসর সাহিত্যিকগণ রামচন্দ্রপুরীর মনোভাবের সংক্রামক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া মনে করিতেছিলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসী (?) হইয়া কেন এত চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করিবেন? শ্রীল দাস রঘুনাথের বৈরাগ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুতে নাই। শ্রীল সনাতনের বৈরাগ্যের বুঝি শ্রীমহাপ্রভুতে অভাব! যে-মহাপ্রভু সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্॥"

সেই মহাপ্রভুতেই ডাঁসা ফল্গু-বিচারের প্রভাবে নানাপ্রকার দোষারোপ হইতে থাকিল! জাহ্নবা মাতার সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিধান, ঈষদুষ্ণ গরম জলে স্নান, দাসী কর্ত্তৃক পরিচর্য্যা প্রভৃতির কথা শুনিয়া কোনও মৎসর প্রাকৃত সাহিত্যিকের জাহ্নবা মাতায় ঠাকুর নরোত্তম অপেক্ষা বৈরাগ্যের ন্যূনতা দর্শন ও সমালোচনা করিবার আস্পর্দ্ধা উপস্থিত হইল!

ভাক্ত-সমাজে বৈরাগ্যের নামে ব্যাভিচার

নির্ম্মৎসর ভাগবত-ধর্ম্মের রহস্য-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ জাগতিক মৎসর-সমাজ পারমার্থিক ও আর্থিকের মুখস পরিয়া বৈরাগ্যের ব্যভিচার আরম্ভ

করিল—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-দীক্ষা ভুলিয়া গেল—প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপের শিক্ষা প্রকৃত-প্রস্তাবে ভুলিয়া যাওয়াকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দীক্ষিত হওয়া মনে করিয়া লইল! কেহ ভোগে, কেহ বা ফল্গুত্যাগে বিষয়ভোগ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাময়, অকৃত্রিম, সহজ যুক্তবৈরাগ্যকে "*কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ*"—ন্যায়ে ভোগ বা বিষয়-আহরণ-ব্যাপার মনে করিতে লাগিল।

"কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধ নাহি, যা'তে খণ্ডে ভবরোগ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থার এই বিচার আরও ভীষণ প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত আকারে উপস্থিত হইল। পাপ-পুণ্য বিষয়-ভোগ-চেষ্টা—ফল্গুত্যাগ ও মর্কট-ত্যাগের আকারে প্রচ্ছন্ন, প্রবল, অতৃপ্ত বিষয়-ভোগাসক্তিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীরূপ-কথিত যুক্তবৈরাগ্যের পুনরুজ্জীবন

এইরূপ দুর্দ্দিনে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপ-শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিয়া "গৌড়ীয়ে"র সহস্রারে 'গৌড়ীয়'র মূলমন্ত্ররূপে অঙ্কিত করিয়া দিলেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

মনঃশিক্ষাচ্ছলে গৌড়পুরের সারস্বত-কুঞ্জে বিশ্বপ্রবাহিনী গীত-লহরীতে গান করিলেন,—

যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥

সে-যুক্তবৈরাগ্য, তাহা ত'সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা-সম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব॥
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ে সম্ভব॥
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা চিন্ত' সেই সব
সেই দু'টী কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব॥
ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব
যে ফল্গু-বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব॥

অনেক কবি অনেক গান গাহেন, কিন্তু শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর, অপ্রাকৃত, সহজ, কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীমদ্ভাগবতীয় শিক্ষার সার-নির্য্যাস-নিঃস্যন্দিনী এই গীতি পরিপূর্ণ বাস্তবতায় প্রদর্শন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিজ হাতে গড়া শ্রীগৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক আচার-অনুষ্ঠান, শ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট অনুগবৃন্দের আচরণ-সমূহ—ঐ গীতিরই আবৃত্তি। প্রতি পদ-বিক্ষেপ, প্রতি কার্য্য, প্রতি অনুষ্ঠান, প্রতি বাক্য, প্রতি প্রচেষ্টা—ঐ গীতির মূর্ত্ত-স্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদ এমন কোন আচরণ শিক্ষা দেন না,—যাহার পূর্ণ অংশ—"**অনাসক্ত-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়-সমূহ সকলি মাধব**"—এই গীতির পূর্ণাবৃত্তি না করে। প্রভুপাদের অখিল চেষ্টা, অখিল ব্যবসায়, অখিল অধ্যবসায়,—"**সে যুক্ত বৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য, তাহাই জড়েতে হরির বৈভব**"—গীতমন্ত্রের জীবন্ত মূর্ত্তি। ইহা যাঁহারা সেবোন্মুখ নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া চমৎকৃত ও পুলকিত হইয়া পড়েন। এই কর্ম্মময় জগতেও এরূপ ষোল-আনা যুক্ত-বৈরাগ্যের আদর্শ একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক আচরণে লক্ষ্য করিয়া আমরা যুক্তবৈরাগ্যকে আর অবাস্তব উপন্যাস বা কবি-কল্পনা মনে করিতে পারি না।

(১১)

প্রভুপাদ ও আচার্য্যত্ব

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি না থাকিলে 'আচার্য্য'-অধ্যয়ন অসম্ভব

আচার্য্য-কৃপাবলে আচার্য্য অধ্যয়ন করিবার প্রয়াস-মুখে আমরা পূর্ব্বে অনেকগুলি কথা আলোচনা করিয়াছি। নিরপেক্ষতার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে প্রভুপাদ আচার্য্যত্বের যে সার্ব্বদেশিকতা অধিকার করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়। এইরূপ আলোচনায় পূর্ণভাবে প্রবেশ এবং আলোচনাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে হইলে কয়েকটী প্রারম্ভিক কথার বিচার প্রয়োজন। আমরা আচার্য্যানুশীলনের ভূমিকা-পত্তনেই ''বর্ষ-পরীক্ষা'' নামক একটী বিষয়-বিচারে (৪ পৃষ্ঠায়) দেখিয়াছি, আচার্য্য স্বীয় কৃপা-সঙ্গ দান-দ্বারা শিষ্য-সম্প্রদায়কে আচার্য্য-অধ্যয়নের একটী সুযোগ প্রদান করেন। শিষ্যের দিক্ হইতে আচার্য্য-সঙ্গ ও অধ্যয়নের যোগ্যতা প্রাপ্তির প্রতিজ্ঞা হইল —প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। এই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবায় শিষ্যের নিরূপেক্ষতার মুক্তপ্রগ্রহ একটুকুও সঙ্কুচিত হয় না—যদি সেই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসাময় ও একান্ত আর্ত্ত হয়। অপরদিকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার ন্যূনাধিক অসদ্ভাব বা কৃত্রিমতা থাকিলে তাহা নিরপেক্ষতার স্বাভাবিক স্বচ্ছতার উপর অসদ্ অহঙ্কাররূপ মায়াবী আগন্তুকের এমন একটা ছায়া-পাত করিয়া দেয় যে, তাহাতে সত্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই পরিভাষাত্রয় সংক্ষিপ্ত শব্দে 'অকপট শুশ্রূষা বা নিষ্কপটে শ্রবণের ইচ্ছা।' নিষ্কপটতাই—নিরপেক্ষতা। শ্রবণের ইচ্ছা যেখানে নাই, সেখানে নিষ্কপটতা নাই—নিরপেক্ষতা নাই। শ্রবণের ইচ্ছা না থাকার তাৎপর্য্যই —'আমি নিজেই সব জানি—আমি যে দলে প্রবিষ্ট হইয়াছি, সেই দলের কথা আমার ইন্দ্রিয়-রোচক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে নারাজ—অসৎসঙ্গের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিব না—পাছে আমার ইন্দ্রিয়-

তৃপ্তিকর ঐ সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হয়।' মনোধর্ম্মের দল সকলই ন্যূনাধিক আপেক্ষিক। এরূপ আপেক্ষিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ বলিয়া আমি নিরপেক্ষতার দেশ কাল-পাত্রের কথা কর্ণে যাহাতে মোটেই না আসে, সেজন্য অনেক কপট-নাট্য করিয়া থাকি।

'নিরপেক্ষতার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তি' বলিতে কি বুঝায়

আমি একান্ত সত্যের কথা শ্রবণ করিব—সত্য যতই কঠোর, সত্য যতই নিরপেক্ষ, সত্য যতই আপাত-নির্ম্মম—সত্য যতই আপাত বিপ্লবী, আপাত-প্রেয়ো-বিধ্বংসী হউক্। সত্য শ্রবণ করিবার ফলে যদি আমার লক্ষ লক্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম এবং বর্ত্তমান জন্মের সারা জীবনের সমস্ত শক্তি, সমস্ত আসক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত বিদ্যা, মনীষা, অভিজ্ঞান, অর্থ, তথাকথিত পরমার্থ, তথাকথিত শ্রদ্ধা, তথাকথিত ভক্তি-দ্বারা গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত চিরসাধের সৌধটী ভূমিকার সহিত বিধ্বংসিত হইয়া পড়ে, তথাপি আমি সত্য-শ্রবণে বিমুখতা অর্থাৎ আমার মনোধর্ম্মের দলের কথায় আপেক্ষিকতা বা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিরপেক্ষতাকে কোনও প্রকারে সঙ্কুচিত করিব না। এরূপ নিরপেক্ষতার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তি থাকিলেই পরিপূর্ণ সত্য-শ্রবণের জন্য পিপাসা হয় এবং শ্রবণকে সর্ব্বতোভাবে অভ্যর্থনা করিতে শ্রবণের যাবতীয় অর্গল মুক্ত এবং আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতেও আমাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী বা জাড্য লক্ষিত হয় না।

সুষ্ঠু শ্রবণ-পথে কি কি বাধা থাকে

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী; অ-'প্রণিপাত' অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-সমীপে আত্মপাতরূপ কামবেগ, অ-'পরিপ্রশ্ন' অর্থাৎ মূকত্ব, ইতর প্রশ্ন-পিপাসারূপ ব্যক্ত বাগ্‌বেগ ও পরমার্থ-প্রশ্নে উদাসীনতারূপ অব্যক্ত বাগ্‌বেগ, অ-'সেবা' অর্থাৎ মনোবেগ বা আত্মার বৃত্তির স্তব্ধভাব—এইগুলি শ্রবণপথের অর্গল। কায়বেগ, বাগ্‌বেগ ও মনোবেগকে শাসনপূর্ব্বক আচার্য্য-শুশ্রূষা (শ্রবণেচ্ছা) বা ত্রিদণ্ড-গ্রহণই—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত আচার্য্য-শ্রবণ-যোগ্যতা।

নিরপেক্ষ-দৃষ্টিতেই শ্রীল প্রভুপাদে আচার্য্যত্বের যথার্থ্যতা অনুধাবন

আচার্য্যকে বুঝিতে হইলে—আচার্য্যের আচার্য্যত্ব অধ্যয়ন করিতে হইলে ঐরূপ যোগ্যতা আবশ্যক। যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া অধ্যয়ন বা উপলব্ধির নিরর্থক অভিমান যেন লোচনহীন-গোষ্ঠীর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন সজ্জিত বিরাট্ প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ-করণ তুল্য। আর যাঁহারা ঐরূপ যোগ্যতা অর্থাৎ পূর্ণ-নিরপেক্ষতা লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদে অদ্বিতীয় আচার্য্যত্ব, অকৃত্রিম আচার্য্যত্ব, অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্ব, সার্ব্বদেশিক আচারময় আচার্য্যত্ব, বাস্তব আচার্য্যত্ব, পূর্ণকল আচার্য্যত্ব, সার্ব্বকালিক আচার্য্যত্ব, সার্ব্বজনীন আচার্য্যত্ব, অবিচিন্ত্য অথচ সেবা-বেদ্য আচার্য্যত্ব, সৎশাস্ত্রসমন্বিত অথচ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা-যুক্ত আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত ও কৃত-কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

অজ্ঞসমাজ 'আচার্য্য' বলিতে কি বুঝিয়া থাকে

জগতে 'আচার্য্য' শব্দটী কথায় আছে—অধিকাংশস্থলে আনুকরণিক ছলনায় বর্ত্তমান আছে। অনর্থগ্রস্ত গণসমষ্টির সাজান অনর্থময় গণগড্ডলিকার চিন্তাস্রোতের ক্রীড়নক, মানুষের মনোধর্ম্মের মঞ্চ-দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্তোলিত বা উৎক্ষিপ্ত অপস্বার্থের কারখানায় উৎপন্ন মনোহারী পুতুল-রূপ তথাকথিত আচার্য্যত্ব জগতের মানব-মনীষাকে রূপকথার মায়াময় সোনার কাঠি, রূপার কাঠির মত স্পর্শ করাইয়া চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই জগতে আচার্য্যানুসন্ধান নাই—আচার্য্যানুশীলন নাই—আচার্য্য-অধ্যয়ন নাই; আছে কেবল ইন্দ্রিয়-মায়ামৃগের অনুসন্ধান—ইন্দ্রিয়-রুচির অনুশীলন।

আমাদের ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের হোতা, আমাদের ইন্দ্রিয়-কামাগ্নির ইন্ধনের প্রতীকই আমাদের সৃষ্ট 'আচার্য্য'। আমাদের যাহার যেরূপ ইন্দ্রিয়-কামাগ্নির ইন্ধন প্রয়োজন, তাহার সেইরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির প্রতীকরূপে এক একটী আচার্য্যের আবির্ভাব। ইন্দ্রিয়রুচি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া "*যা'র যা'র গুরু, তা'র তা'র কাছে*", "*যা'র যা'র আচার্য্য, তা'র তা'র কাছে!*" অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতীক বা জোগানদার আমার কবলে কবলিত, তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতীক

বা জোগানদার তোমার কবলে কবলিত, তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতীক বা জোগানদার তাহার কবলে কবলিত। এক কথায়, আচার্য্যত্ব যেন ইন্দ্রিয়বাধ্য-গণের কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যবিশেষ। এক এক ইন্দ্রিয়-দাসের এক একটী বিশেষ উত্তেজনাময়ী রুচির এক একটী ছাঁচ আছে; তত্তৎ ছাঁচে ফেলিয়া, পিটিয়া, গড়িয়া, আকার দিয়া এক এক প্রকার ভোগযুক্ত রুচির ক্রীড়নক-স্বরূপ এক একটী আচার্য্য (?) উৎপন্ন হইতেছে!

তথাকথিত 'আচার্য্য'গণের স্বরূপ

এইরূপ কারখানায় প্রস্তুত, হঠাৎ সিদ্ধ, হঠাৎ অবতার আচার্য্যগণের মধ্যে মাঝে মাঝে ২/৪টী ব্যক্তি কোনও প্রাক্তন ভাগ্য-ফলেই হউক, অথবা গণরঞ্জন-কৌশলে অধিকতর দক্ষ থাকার দরুণই হউক, মানুষের নিকট হইতে খুব বড় বড় মঞ্চ প্রাপ্ত হইয়া আকাশ অতিক্রম করিয়া কখনও স্বর্গরাজ্য, কখনও স্বর্গরাজ্য ছাড়াইয়া ব্রহ্মলোক (নির্ব্বিশেষ), কখনও বা কল্পিত বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত নীত হইয়াছেন, কেহ ঐরূপ বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পাইয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, আনুকরণিক কল্পিত গোলোকের ঊর্দ্ধে—কেহ বা ঐরূপ গোলোক বৈকুণ্ঠকে 'ছোট' ও 'নশ্বর' স্থান মনে করিয়া "মই-এর ঠেলা"য় শূন্যমার্গে বা জ্যোতির্ম্ময়-মার্গে উপনীত হইতেছেন।

বাস্তব সত্যের বিস্তারকারী 'আচার্য্য' দুর্ল্লভ

মঞ্চের কৃপায় আচার্য্য অনেকেই হয়, শিষ্যের (?) ইন্দ্রিয়রুচির যোগানদার আচার্য্যেরও অভাব নাই, গণসমষ্টির কারখানায় প্রস্তুত, হঠাৎ সিদ্ধ আচার্য্য ও অবতারগণেরও অবধি নাই; কিন্তু অকৃত্রিম, অতিমর্ত্ত্য, অদ্বিতীয় আচার্য্যের একান্ত অভাব। সেরূপ 'আচার্য্য' রাস্তায় ঘাটে বহু সৃষ্ট হয় না—তবে রাস্তায় ঘাটে বহুর নিকট সেরূপ আচার্য্য তাঁহার স্বাভাবিক কৃপা-বিস্তারকারী স্বভাব-বশতঃ কীর্ত্তন-মুখে বাস্তব সত্য বিস্তার করেন—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-প্রবণতার সম্মুখে সেই আচার্য্য তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে করিতে সেবোন্মুখের অধিকতর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির উদ্বোধন করিয়া নিজ স্বরূপ অধিকতর সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের 'আচার্য্য'ত্ব প্রকাশে তথাকথিত আচার্য্যগণের অবৈধতা প্রকাশ

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, 'আচার্য্য'-শব্দটী কেবল কথায় ছিল; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুক কৃপা-বলে আচার্য্য-শব্দটী শ্রীবিগ্রহরূপে, শ্রীমূর্ত্তি-রূপে, পূর্ণকল-রূপে, সমগ্ররূপে, নিরঙ্কুশরূপে, নির্হেতুকরূপে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদে প্রত্যক্ষ করিবার কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য পাইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বের আলোকে তথাকথিত আচার্য্যত্বের মৌখিকতা, ফল্গুতা ও কৃত্রিমতা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব দর্শন করিবার পূর্ব্বে গণগড্ডলিকার স্রোতকে উপেক্ষা করিবার ত' বল ছিলই না, অধিকন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি মঞ্চ-কৃপায় জগতের দশটা লৌকিক প্রসিদ্ধ লোকের মুখে 'সিদ্ধ মহাপুরুষ', 'অবতার', 'সাধু', 'গুরু', 'আচার্য্য' প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে সেই কথিত মহাপুরুষের (?) সম্বন্ধে কোনও পূর্ব্বপক্ষ করা যাইতে পারে, এরূপ সাহসও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষতা বলিয়াই বিচারিত হইত—এত লোক যাহাকে পূজা করেন—'অবতার' বলেন—'মহাপুরুষ' বলেন—'জগদ্‌গুরু' বলেন—'সিদ্ধ' বলেন, তিনি অনেক কমা হইলেও ত' অনেক বেশী—পারমার্থিক জগতের অন্ততঃ একজন প্রামাণিক পুরুষ। অন্ততঃ এই বিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করিবার সাহস কাহারও ছিল না। কিন্তু যে-দিন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিরপেক্ষ ও অকৃত্রিম আচার্য্যত্ব আবিষ্কৃত হইল, সে-দিন—বাস্তব সত্যানুসন্ধানের এমন একটী দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র প্রকাশিত হইল যে, তাহাতে পূর্ণ নিরপেক্ষতাকে সত্যসাক্ষী রাখিয়া বুঝিতে পারা গেল।

লোক-প্রিয়তা বা লোক-বিদ্রোহিতা আচার্য্যত্বের লক্ষণ নহে

জগতে—বিশ্বে এমন লোক থাকিতে পারে, যে হয় ত' জগতের শতকরা প্রায় শত ব্যক্তির নিকট 'আচার্য্য', 'অবতার', 'সিদ্ধ' বা 'জগদ্গুরু' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, প্রথিত, প্রচারিত রহিয়াছে; কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তি পারমার্থিক হওয়া দূরে থাকুক, অবতার না হইয়া অন্ততঃ সামান্য সাধু-শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়া

দূরে থাকুক, সে মনুষ্য-পদবাচ্যও নহে—একটী অজ্ঞান প্রমত্ত পশু—পাষণ্ড! অথচ সেই অজ্ঞ পাষণ্ডের পক্ষে জগতের শতকরা প্রায় শত জন লোক ভোট প্রদানের জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! এরূপ বিশ্বগ্রাসী বিবর্ত্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আনয়ন করা বাস্তবতায় দূরে থাকুক, কল্পনায়ও যদি কেহ চেষ্টা করে, তবে জগতের গণগোষ্ঠী ঐরূপ ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই 'পাগলা গারদে' প্রেরণ করিবে, না হয়, তাহাকে পিষিয়া মারিবে। কিন্তু জগতের প্রাকৃত ঐতিহাসিক সত্য, অনেক প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের মধ্যেও ঐরূপ প্রাকৃত সত্যের প্রথম আবিষ্কারককে এইরূপ শত শত ব্যক্তির দ্বারা পেষিত, উন্মাদাগারে নিঃক্ষিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। তবে ঐরূপ দৃষ্টান্তের দোহাই দিয়া যে-কোনও ধর্ম্মোন্মত্তের (fanatic) ধর্ম্মোন্মত্ততা, অবৈধ আনুকরণিক উত্তেজনাই যদি সত্য-পরিচয়ের স্বরূপ-লক্ষণ হয়—বহুজন-বিদিত অভিজ্ঞানের প্রতি বিদ্রোহই যদি সত্যানুসন্ধিৎসার স্বরূপ-লক্ষণ হয়, তবে ইহা অপেক্ষা অসত্য স্বরূপের দ্বিতীয় প্রতীক আর কি হইতে পারে? ঐরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা ও অবৈধ আনুকরণিক উত্তেজনায় যে আচার্য্যত্ব নিরূপণ এবং লোক-বিদ্রোহ কিংবা পুরুষ-বিদ্রোহ বা মহাপুরুষ-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই আচার্য্যত্বের লক্ষণ নহে, ইহাও আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সার্ব্বদেশিক শোভা ও সমন্বয়যুক্ত আচার্য্যত্বের আলোকেই দর্শন করিবার উপযোগিতা পাইয়াছি।

তথাকথিত ও প্রকৃত আচার্য্যত্ব অধ্যয়নের মধ্যে পার্থক্য

অনেক আচার্য্যত্বের শোভা পলাশ পুষ্পের ন্যায় কিম্বা ঋতু-পুষ্পের (season flower) ন্যায় অথবা মরুভূমিতে পথ-ভ্রান্ত পথিকের নিকট আলেয়ার আলোকের ন্যায় আপাতসুন্দর মনোরম ও আশাপ্রদ; কিন্তু বিচার, অধ্যয়ন বা পরীক্ষার পর তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না। জগদ্‌গুরুর আচার্য্যত্বের সারবত্তা—মলয়জ চন্দনের ন্যায়—যত ঘর্ষিত করা যায়—যত বিচার করা যায় (ধর্ম্মোন্মত্ততার কল্পনায় বা ইন্দ্রিয়-রুচির দর্পণে নহে)—যত অধ্যয়ন, যত অনুশীলন করা যায়, ততই উদার-মধুর-শান্ত-স্নিগ্ধ গন্ধে আত্মা আমোদিত, প্রফুল্ল ও বিকচিত হইতে থাকে। অসার আচার্য্যতার মৌখিকতা

আনুকরণিক-প্রতিযোগিতাময়ী চেষ্টা-দ্বারা ঘর্ষণ করিলে ইন্দ্রিয়-রোচকতার বৃদ্ধিতে যে একটা ছলনাময়ী আপাত তৃপ্তি কল্পিত হয়, তাহা একদিন না একদিন জ্বালা উৎপাদন করে।

শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্বের মহিমা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্বের একটি মহিমা এই যে,—তাহা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের কৃপার ন্যায় যতই বিচার করা যায়, ততই চমৎকারিতা উৎপাদন করে। কৃত্রিম বস্তুর বাহ্য চাকচিক্য খুব বেশী, অন্তর চাকচিক্য মোটেই নাই—উহা একেবারে অসার। কৃত্রিম আচার্য্যত্বের বাহ্য চাকচিক্য, বাহ্য আকর্ষণ এত আছে যে, সাধারণ লোক অকৃত্রিমকে ফেলিয়া কৃত্রিমকেই অধিক মূল্য দিয়া গ্রহণ করে। অক্ষজ নেত্রে কৃত্রিমতার চাকচিক্য চিরদিনই অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম ও অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্ব সেই জন্য অক্ষজনেত্রে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত না হইলেও অক্ষজনেত্রও সেই অতি মহান্ ঐশ্বর্য্য-বিস্তারী আচার্য্যত্বের নিকট প্রণত হয়—তাঁহাকে কিছুতেই উলঙ্ঘন করিতে পারে না। সেই অতিমর্ত্ত্য আচার্যত্বের এমন একটা অলৌকিক ব্যক্তিত্ব আছে যে, যিনি যত বড়ই অক্ষজ অভিজ্ঞানে ভরপুর হউন, একবার সেই অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের সম্মুখে উপস্থিত হইলে—একবার সেই অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের কীর্ত্তন-অস্ত্রোপচারের বিষয় হইলে, ঐরূপ অক্ষজজ্ঞান মদমত্ত ব্যক্তিরও অন্ততঃ অন্তরে সেই অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্বের মহিমা ও শক্তিকে অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। এরূপ দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য।

তথাকথিত আচার্য্যগণ আত্মার জাগরণ ঘটাইতে অসমর্থ

আচার্য্য-নামধারী বা কল্পিত কিংবা মানব-সৃষ্ট আচার্য্য-সমূহের আদর্শ দেখিলে হৃদয়ে হরিভজনের জন্য পূর্ণ প্রেরণা আসে না—আত্মা হরিভজনের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হয় না—মনে হয় না যে, হরিভজনই একমাত্র সার্ব্বকালিক মুখ্য কৃত্য। তথাকথিত আচার্য্যের আদর্শ আত্মার জাড্য—প্রসুপ্তি ভাঙ্গিতে পারে না। তাহাদের আদর্শ দেখিলে মনে হয়, হরিভজন একটা

কথার কথা—মানবের বহুপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রকারের মধ্যে একটা প্রকার-বিশেষ—সুখ-শান্তির বহুবিধ উপায়ের মধ্যে একটা সুলভ উপায়-বিশেষ। তাহাদের আদর্শ দেখিলে মনে হয়, উদরান্ন-সংস্থান, অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে ভোগবিলাস-আহরণ—ভোগে-ত্যাগে, পাপে-পুণ্যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য—হরিভজনও প্রকারান্তরে তাহাই। তাহাদের আদর্শ দেখিলে মনে হয় হরিভজন—গৌণ; অন্যান্য বিষয়-চেষ্টাই মুখ্য। তাহাদের আদর্শ দেখিলে মনে হয়, হরিভজন optional; কিন্তু অন্যান্য তথাকথিত কর্ত্তব্য compulsory। তাহারা অপস্বার্থের—আমাদের আত্মার অধঃপতনের অন্যান্য কর্ত্তব্যতাকেই 'হরিভজন' বলিয়া চালাইয়া স্বার্থগতি হরির বাস্তব ভজনরাজ্যের উপর যে যবনিকা টানিয়া দেন, তাহাতে ইতর কর্ত্তব্যতার স্থূল তুষাবঘাতই জীবনের কৃত্য এবং বাস্তবতা বলিয়া মনে হয়।

তাহাদের আচার্য্যত্বের আদর্শ পরমেশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব—পরমেশ্বরের পূর্ণ নিরঙ্কুশতা—পরমেশ্বরের পরিকর-শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-সেবার একান্ত কর্ত্তব্যতা প্রমাণিত করিতে পারে না। তাহাদের কৃত্রিম, অশ্রৌত আচার্য্যত্ব "**যথা দেবে তথা গুরৌ**"—শ্রুতি-শ্রবণ-যোগ্যতা প্রদানের জন্য শিষ্যের কর্ণবেধ-সংস্কার করিতে পারে না—তাহাদের অবাস্তব আচার্য্যত্ব আচার্য্যকে বাস্তবতায় কৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ, কৃষ্ণপ্রিয়তম-রূপে দর্শন করাইতে পারে না। কারণ, তাহাদের সমশীল শিষ্যগণ আত্ম-প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ-কল্পে কপটতা ও মৌখিকতায় আচার্য্যকে যত কিছুই কল্পনা করুক না কেন, অন্তরে জানে, ঐরূপ ব্যক্তি কখনও ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ, কৃষ্ণের প্রিয়তম হইতে পারে না—কথায় বলিতে হয়—না বলিলে সাংসারিক কি জানি কি অসুবিধা হইতে পারে, অথবা আত্ম-প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতে পারে, তাই তাহারা 'শিখান কথা'—'মুখস্থ করা কথা' উপলব্ধি ব্যতীত উদ্গীরণ করে। ঐ সকল কল্পিত আচার্য্যে আচার্য্যত্ব কস্মিন্‌কালেও এই সকল কপটতার ছেদন করিতে পারে না। তাহাদের আচার্য্যত্ব অপস্বার্থপরতা পোষণ করে—নিষ্কপট নিঃস্বার্থপরতা, নির্হেতুক পরার্থপরতা ও শুদ্ধ স্বার্থপরতার সমন্বয় প্রদর্শন করিতে পারে না—তাহাদের

আচার্য্যত্ব পূর্ণ-শিষ্যত্বে পূর্ণ-আচার্য্যত্বের অধিকার প্রদান করিতে পারে না। যাঁহার নিজের আচরণ পূর্ণ—সমগ্র—আদর্শ, তাঁহারই ত' আদর্শে অপরে প্রস্তুত হইতে পারিবে। যিনি অপরকে আচার্য্যত্বে প্রকাশ করিতে না পারেন, জানিতে হইবে তাঁহারও আচার্য্যত্ব নাই—যদি থাকিত, তবে সেই আচার্য্যত্ব অপর ব্যক্তিত্বে সঞ্চারিত, প্রবাহিত ও বিস্তারিত হইতে পারিত। যাঁহার পিতৃত্ব আছে, তিনিই ত' অপরের পিতৃত্বের যোগ্যতা দিতে পারেন—যাঁহার পিতৃত্ব নাই, তিনি অপরকেও পিতৃত্বের যোগ্যতা প্রদান করিতে পারেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, 'হরিভজন' বলিতে কি বুঝায়

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব আবিষ্কৃত হইলে সকল অভাব বিদূরিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব গল্পের কথায় নহে—উপন্যাসিক কল্পনায় নহে—কবির কাব্যসৃষ্টি কলায় নহে; পরন্তু পরম বাস্তবতায়—একান্ত বাস্তবতায়—নিরপেক্ষ সেবা—প্রত্যক্ষ সেবা—পরীক্ষিত উদাহরণে প্রমাণিত করিয়াছে—প্রমাণিত করিয়া অনুক্ষণ অনুপ্রেরণা আনয়ন করিয়াছে যে, হরিভজন—বাস্তব, হরিভজন—সার্ব্বকালিক, হরিভজন—ঐকান্তিক, হরিভজন—যথাসর্ব্বস্ব। অগ্নিকুণ্ডের পারিপার্শ্বিক কুম্ভস্থ ঘৃতরাশিকে যেমন জাড্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গলিতেই (তরল হইতেই) হইবে, তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বের পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিগণ যতই অনভিজ্ঞ হউন না কেন, তাঁহাদিগকে হরিভজনের বাস্তবতা, সার্ব্বকালিকতা, যথা-সর্ব্বস্বতা বুঝিতেই হইবে—ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়ও হরির সেবানুকূল কার্য্য করিয়া ফেলিতেই হইবে। একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বই পূর্ণ প্রভাবের সহিত প্রমাণ করিয়াছে—হরিভজন সার্ব্বকালিক, উহা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের কোনও প্রকাশ-বিশেষ নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কিংবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ যে হরিভজন নহে, তাহা কার্য্য-কলাপে আচরণ করা যায় নাই—হরিভজনের অভিনয়ের পোষাকে ইন্দ্রিয়ের বহুরূপিণী ছলনা-কপটতা ধরা যায় নাই; কিন্তু শ্রীল

প্রভুপাদের আচার্য্যত্বের জীবন্ত আদর্শ হরিভজনের অনভিজ্ঞ জনকেও চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান-পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিয়াছে,—আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ হরিভজন নহে; শ্রীল প্রভুপাদের অদ্বিতীয় আদর্শ, আচরণ—অনভিজ্ঞ, অচল, জাড্যগ্রস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম-গুলিতেও প্রেরণা আনিয়াছে—সেই প্রেরণা যেন মজ্জায় মজ্জায় বৈদ্যুতিক শক্তির মত প্রবাহিত হইয়া অবশেও, অভ্যাসেও স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—ইন্দ্রিয়-তর্পণ হরিভজন নহে—অন্য কর্ত্তব্যতা-বুদ্ধি হরিভজন নহে; হরিভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—আত্মার নির্ম্মল স্বভাব—স্বাভাবিকা বৃত্তি। প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব অন্তরাত্মায় শিক্ষা সঞ্চার করিয়া উপলব্ধি করাইয়া দিতেছে—হরিভজন ত' optional নহেই, compulsory মাত্রও নহে—হরিভজন আত্মার স্বাভাবিকী অনুরাগময়ী রোচনা-প্রবৃত্তি—হরিভজন আত্মার সহজ স্বাস্থ্য —হরিভজন আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব কষিয়া দেখাইয়াছে,—অন্য কর্ত্তব্যতা হরিভজনের ছলনার কৃত্রিম ময়ূর-পুচ্ছে সাজাইলেও সবিশেষ পুরুষোত্তমের পূর্ণসুখতাৎপর্য্য-অনুসন্ধানেই নিখিল কর্ত্তব্যতা বা একমাত্র কর্ত্তব্যতা নিহিত—তাহাতেই প্রকৃত শুদ্ধ স্বার্থের সীমা। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব আচার্য্যব্রুবগণের আদর্শে যে পরমেশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বের প্রতি সংশয়-প্রবণতা, অজ্ঞেয়তা-প্রবণতা, নির্ব্বিশেষভাব-বিচার-প্রবণতা, শূন্যভাব-প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব-হীনতা কিংবা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা ও স্বারাজ্যের প্রতি সন্দেহ-প্রবণতা বা উদাসীনতা সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূলিত করিয়া পরমেশ্বরের বাস্তব, নিরঙ্কুশ, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, পূর্ণতম, সবিশেষ অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বস্তু অপেক্ষাও অধিকতর প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে বলদেবত্ব প্রকাশিত

যে আচার্য্যত্বকে ত্রিজগতের কোনও বস্তু মুহূর্ত্তের জন্যও বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে না, সেই আচার্য্যত্ব অনুক্ষণ যে-বস্তুর নিকট সমগ্রতার সহিত বিনমিত হন, বিশ্বকে সমগ্রতার সহিত বিনমিত করাইতে অখিলচেষ্ট হন, সেই বস্তুর একান্ত বাস্তবতা—পরিপূর্ণতমত্ব—নিরঙ্কুশত্ব—সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ঔদার্য্যময়ত্ব স্বপ্নেও সন্দেহ-প্রবণতা আনয়ন করিতে পারে না। ইহাকেই

বলে—আদর্শ, ইহাকেই বলে—জীবন্ত, জ্বলন্ত, সচেতন আচার্য্যত্ব—যাঁহার আকর্ষণী শক্তি আছে—প্রেরণা শক্তি আছে—নাস্তিকতার আভাসকেও হৃদয় হইতে চিরতরে উন্মূলিত করিবার অসাধারণী ক্ষমতা আছে, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে বাস্তবতায়—চেতনতায়—আনন্দময়তায় স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার অসমোর্দ্ধ, অদ্বিতীয় সামর্থ্য আছে। এইরূপ আচার্য্যত্বই—বলদেবত্ব—যেখানে বল নিরন্তর ক্রীড়া করে—দুর্ব্বলে বল সঞ্চারিত করে। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব নিরন্তর আত্মার দিব্য বল সঞ্চার করে। ইহা প্রত্যক্ষ শতকরা শতবার অব্যর্থরূপে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি। দুর্ব্বলতার শত শত দুর্ল্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্ব্বত—জন্ম-জন্মান্তরীয় জাড্যের হিমালয়—আসক্তির আগ্নেয়গিরি শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বের সম্মুখীন হইবা মাত্র যেন বিনা সাধনে—বিনা আয়াসে অবশে ভস্মীভূত—উন্মূলিত হইয়া যায়—আর তথায় যেন সেবা-সুন্দর-সৌধের এক নব ভূমিকা-পত্তন হয়—নব সেবা-আশাবন্ধের নব অরুণোদয় হয়।

ময়ূর-পিঞ্ছধারী কাকের কপটতা প্রকাশ হয় ময়ূরের আগমনে

শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব অতি সহজ—অতি স্বাভাবিক—অতি অকৃত্রিম। পোষাকী আচার্য্যত্ব—ঋণগ্রস্ত আচার্য্যত্ব—কৃপণ আচার্য্যত্ব—কৃত্রিম আচার্য্যত্ব—আনুকরণিক আচার্য্যত্ব—লোক-দেখান আচার্য্যত্ব—লোক-ঠকান আচার্য্যত্বের ছবি জগতে অনেক দেখা যায়। কিন্তু ঐসকল কৃত্রিম আচার্য্যত্বরূপ (?) কাচরাশির কৃত্রিমতাও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম, অহৈতুক, সহজ আচার্য্যত্ব-রূপ নিকষমণি আবিষ্কৃত না হইলে আমরা কিছুতেই ধরিতে পারিতাম না। কৃত্রিম ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত বায়স আনুকরণিক প্রতিযোগিতা-বৃত্তি লইয়া যতই কেন না চিত্তরঞ্জক অভিনয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক গণবঞ্চনা করুক, সেখানে কোনক্রমে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক শিখিরাজ উপস্থিত হইয়া পড়িলে বায়সের অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন নাট্য ও মুদ্রাগুলি সূক্ষ্ম-দর্শিগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম আচার্য্যত্বের আবিষ্কারে কৃত্রিম আনুকরণিক আচার্য্যব্রুবগণের অভিনয় তদ্রূপ দশাই প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভাষা অসমর্থ প্রভুপাদের আচার্য্য-বিগ্রহতার সামগ্রিক বর্ণনে

পক্ষান্তরে শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব—অতিমর্ত্ত্য-সাহজিকতা ও অকৃত্রিমতা প্রমাণিত করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতি আচার-প্রচার ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ব্যবহার, ঘটনা, প্রতি মুদ্রা, প্রতি কার্য্য তাঁহার আচার্য্য-স্বভাবকে বিগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে—প্রভুপাদের আচার্য্য-বিগ্রহতা এত সহজ—এত অকৃত্রিম—এত স্বাভাবিক যে, তাহা দুর্ব্বলা, অসমর্থা ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া মনে হইতেছে,—ভাষা-দ্বারে যেন সেই অতিমর্ত্ত্য অকৃত্রিমতা—অতিমর্ত্ত্য সাহজিকতা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইল না, যতটা সমগ্র-ভাবে প্রভুপাদের স্বপ্রকাশ আচরণ ও ব্যক্তিত্ব সহজ করিয়া প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব তাৎকালিক নহে, সার্ব্বকালিক

বক্তৃতা-মঞ্চে আসিলে, শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় বসিলে, শিষ্য-গৃহে গমন করিলে, বাহিরের লোকজন দেখিলে অনেকে আচার্য্যত্বের সাজ-পোষাক গ্রহণ করেন। এই সকলই পোষাকী আচার্য্যত্বের অভিনয়। অর্থাৎ ইহাদের স্বাভাবিক আচার্য্যত্ব নাই—ইহাদের অন্যান্য কৃত্য, শতসহস্র প্রকার বাসনা, জীবনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে, উহারা কেবল কোনও অপস্বার্থময় অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু সময়ের জন্য আচার্য্যত্বের কৃত্রিম মুদ্রা কর্জ্জ করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সর্ব্ব ক্ষণ, সর্ব্ব কার্য্য, সর্ব্ব চেষ্টা, সর্ব্ব বাসনা, সমগ্র চরিত্র, সমগ্র মুদ্রা, সমগ্র শীল, সমগ্র ব্যবসায়, সমগ্র অস্মিতা, সমগ্র আচার-ব্যবহার, সমগ্র উদ্দেশ্য অকৃত্রিম হরিসেবোন্মুখগণের চক্ষের সম্মুখে অনুক্ষণ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। তাহা পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ হয় যে, তাঁহাতে কেবল শতকরা শত পরিমাণ পূর্ণতম ঐকান্তিক হরিসেবা-সাহজিকতা-প্রচুর স্বভাব ব্যতীত বিন্দুমাত্রও কৃত্রিমতার, আচার্য্য-স্বরূপ ব্যতীত লেশমাত্রও 'পোষাকী' বা সজ্জিত ভাবের অস্তিত্ব নাই। নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতিমুহূর্ত্তে প্রভুপাদে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর হইয়াছে যে, প্রভুপাদের বক্তৃতা-মঞ্চে যেরূপ বেশ, আবেশ, ভাব, অনুভাব, সর্ব্বসময়েও সেইরূপ বেশ, আবেশ, ভাব, অনুভাব। লোকজন দেখিয়া কৃত্রিমতা করিয়া একপ্রকার

ভাব প্রদর্শন, আর লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে অন্যপ্রকারে ইতর ভাব সংরক্ষণ; লোকজন দেখিয়া জড়ে অনাসক্তি প্রদর্শন, আর লোকের চক্ষের অন্তরালে গৃহ-দেহাদিতে আসক্তি-সংরক্ষণ প্রভৃতি "*সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ*"—বাক্যের প্রতীক-স্বরূপ আচার্য্যত্ব অবশেও প্রভুপাদকে কোন মুহূর্ত্ত স্পর্শ করিতে পারে না—ইহা যে-কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ—'আশ্রয়বিগ্রহ' ভগবান্;
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহার দ্বিতীয় 'বিষয়' নাই

লৌকিক আচার্য্যব্রুবগণের পৃথক্ গৃহ, পৃথক্ সম্পত্তি, পৃথক্ আত্মীয় স্বজন, পৃথক্ সংসার, পৃথক্ বাসনা, পৃথক্ উল্লাস, পৃথক্ দুঃখ, পৃথক্ বিরহ, পৃথক্ মিলন, পৃথক্ কার্য্য, পৃথক্ অভিনিবেশ আছে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কোন কিছুই পৃথক্ নাই—তাঁহার সকলই স্বাভাবিক অদ্বয়জ্ঞান—সকলই কৃষ্ণকে লইয়া—কাজেই সেখানে কৃত্রিমতা বা পোষাকী ভাব নাই—লোক দেখান ভাব নাই। তাঁহার উল্লাস-আনন্দের বিষয় যিনি, দুঃখ-বিরহলীলার বিষয়ও তিনি—সেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। আর ইহা অতি স্বাভাবিকরূপে শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে দেদীপ্যমান। প্রভুপাদের বিষয়-কথা, চাল-ধানের কথা, জমাজমির কথা, ঘর-বাড়ীর কথা, ক্রোধ-প্রসন্নতার কথা, সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাদির কথা, পূর্ণ কৃষ্ণকথা—অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণকথা হইতে এক পাই কম কোন ইতর কথা নহে; কারণ, বিষয় অদ্বয়জ্ঞান—পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহে। যাঁহারা আচার্য্য-সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিরন্তর নিরপেক্ষ হৃদয়ে আচার্য্যের শ্রবণ-কীর্ত্তন-কৃপা প্রভাবে—এইসকল অধ্যয়ন না করিয়াছেন, তাঁহারা বাহ্যমাত্র দেখিয়া বঞ্চিত হন, আর যাঁহারা আচার্য্য-কৃপায় আচার্য্য-সঙ্গে আচার্য্য-অধ্যয়ন করিতে পারেন, তাঁহারা এই অধ্যয়নের আভাস মধ্যেও মহাচমৎকারিতার সাম্রাজ্য—মহাচমৎকারিতার স্বারাজ্য-শ্রীকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ পুলকিত হইয়া থাকেন—শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য অসমোর্দ্ধ আচার্য্যত্বে তাঁহাদের চিত্তভৃঙ্গ গাঢ় হইতে গাঢ়তর, গাঢ়তর হইতে গাঢ়তম, গাঢ়তম হইতে প্রগাঢ়তম হইয়া সংলগ্ন হয়।

"চিত্ত কাড়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥"

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় শ্রীগোপিকা-শিরোমণির এই উক্তি যেন শ্রীল প্রভুপাদের সহজ আচার্য্যত্বে পূর্ণমূর্ত্তিমতী হইয়া রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব এইরূপ সহজ। জগতের আচার্য্যব্রুবগণের আচার্য্যত্বের আনুকরণিক অবৈধ অভিনয় হইতে এইখানেই পার্থক্য।

তথাকথিত আচার্য্য স্বয়ংই ঋণগ্রস্ত,
সুতরাং অপরকে ধনান্বিত করিতে অসমর্থ

জগতে ঋণগ্রস্ত আচার্য্যত্বই প্রত্যক্ষ হয়—আর ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণ-ধনময় আচার্য্যত্বের সম্মুখে তুলিত হইবার ফলেই আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ঋণগ্রস্ত আচার্য্যত্বের লক্ষণ এই যে, উহার স্বাভাবিক মৌলিকত্ব নাই এবং উহা হইতে কিছু প্রদত্ত হইলেই উহা ব্যয়িত বা কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবার ভয়াকুলতা সংরক্ষণ করে। ঋণগ্রস্ত আচার্য্যত্বাভিনয় 'ইহার কথা, তাহার কথা' মাত্র আহরণ করেন; কে বৈষ্ণব, কে অবৈষ্ণব, কে প্রকৃত ভগবৎ-প্রেরিত আচার্য্য, কে গণমত-সৃষ্ট আচার্য্য, ইহা চিনিয়া লইবার ক্ষমতা তথাকথিত আচার্য্যগণের নাই—তাহারা লোকের মুখে ঝাল খান—লোকের ধার ধারেন—লোক-প্রিয়তার নিকট আত্মাকে 'রেহান' (বন্ধক) রাখিয়া আচার্য্যত্বের কারবার করেন,—কখনও কখনও লোক-প্রিয়তার চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রদান করিতে গিয়া কৃষ্ণকে (?) পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। ঋণগ্রস্ত আচার্য্যত্ব ঐসকল লোকপ্রিয়তা-অর্জ্জনকারীগণের কথা আহরণ করেন, তাহাদের নিজের কোনই মূলধন নাই—যে মূলধন আত্মা ছিল, তাহা ত' বন্ধকী সম্পত্তি, কাজেই অত্যন্ত সুপ্ত, অতি জড়ীয় ভারগ্রস্ত। এইরূপ নানা লোক ও নানা পুস্তকের মনোধর্ম্ম-সংযুক্ত ও অসমন্বিত বাক্যগুলি লইয়া যে আচার্য্যত্বের ব্যবসায় হয়, তাহা হইতে কিছু প্রদান করিতে গেলেই উহার সম্বল ফুরাইয়া যায়।

প্রভুপাদের পূর্ণ ধনময় আচার্য্যত্ব
অপরকেও পূর্ণ ধনশালী করিতে সমর্থ

কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব পূর্ণ ধনশালী—তাই তাঁহার উপদেশরাজি সম্পূর্ণ মৌলিক। মৌলিকত্বে শ্রৌত বিচার-বিরোধ নাই, কিন্তু শ্রৌত বিচারের সুসমন্বয় ও সুবিস্তার-সৌন্দর্য্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ইহাই প্রকৃত মৌলিকত্ব। যাঁহার সমগ্রতা শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আলিঙ্গিত, তাঁহার বাণী শ্রীকৃষ্ণচরণ হইতেই নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে—কাজেই সেখানে অফুরন্ত মৌলিকতার ভাণ্ডার উন্মুক্ত। সেখানে লোক-দেখান আচার্য্যত্ব নাই বটে, কিন্তু অগ্নি যেমন দাহ্য পদার্থ পাইলে বিপুল হইয়া প্রকাশিত হয়, সেরূপ শুশ্রূষু লোকের সেবোন্মুখতার পরিমাণ-অনুসারে শ্রীল প্রভুপাদের চেতনময়ী, অতিমর্ত্ত্য, অফুরন্ত বাণীর মৌলিকত্বও তৎপরিমাণে বিপুল নবনবায়মান হইয়া প্রকাশিত হয়। আত্মবস্তু, চেতনবস্তু—খরচ হইয়া যায় না—ফুরাইয়া যায় না। কিন্তু ঋণগ্রস্ত আচার্য্যগণ অনাত্মবস্তু—অচেতন বস্তু—কৃত্রিম বস্তু বা অবস্তু লইয়া কারবার করেন বলিয়া তাঁহারা অপরকে ত' ধনী করিতে পারেনই না, নিজেরাও অপরকে (অবাস্তব) কিছু দিলেই পাছে ফুরাইয়া যাইবে, এই ভয় করেন। সুতরাং ঋণগ্রস্ত আচার্য্যব্রুবগণ তাহাদের শিষ্যব্রুবগণকে কি করিয়া 'আচার্য্য' করিবেন?

কিন্তু পূর্ণ ধনশালী শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রত্যেক দাসানুদাসকে আচার্য্যত্বে আহ্বান করেন,—অধিক কি, সমগ্র জগৎকে অনাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার্য্যত্বের জন্য আহ্বান করিয়াছেন—শিষ্যকে পূর্ণধনশালী, পূর্ণ আচার্য্য না করা পর্য্যন্ত প্রভুপাদের কিছুতেই সন্তোষ হয় না—শিষ্যের আচার্য্যত্বের বিন্দুমাত্র ন্যূনতাও—সেবাধন প্রাপ্তির এক পাই কম থাকিলেও প্রভুপাদের মন উঠে না—শ্রীল প্রভুপাদ চাহেন,—সকলকে পূর্ণ ধনশালী করিতে; কারণ, তাঁহার আচার্য্যত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত—লোকের দেওয়া বা ধার করা, কিংবা স্বকপোল-কল্পিত আচার্য্যত্বাভিনয় নহে। তাই তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় অকৃত্রিমভাবে বিশ্বকে আহ্বান করিয়া বলিতে পারেন,—

''একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যা'ব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলা'ব॥''

* * *

''একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥''

* * *

''অতএব সব ফল তেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে॥
ভারত ভূমেতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥''

* * *

''যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা' এই দেশ॥
কভু না বাঁধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥''

অকৃপণ আচার্য্যত্ব—নির্ম্মৎসর আচার্য্যত্ব—অহিংসক আচার্য্যত্ব—মহাবদান্য আচার্য্যত্বই বিশ্ববাসীকে অকৃত্রিমভাবে আচার্য্যত্বে আহ্বান করিতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য অসমোর্দ্ধ আচার্য্যত্বে ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়।

শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ণতম আচার-প্রচারের সেনাপতি

শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব পূর্ণতম আচার ও পূর্ণতম প্রচারের মূর্ত্ত আদর্শ।

''আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার' নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥''

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রতি শ্রীসনাতন প্রভুর এই উক্তির পূর্ণতম-স্বরূপতা শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে দেদীপ্যমান। ''**যুক্ত বৈরাগ্য সব আদেশিল।**

ফল্গু বৈরাগ্য সব নিষেধিল॥"—শ্রীল সনাতন-শিক্ষার এই আচার ও প্রচার এইরূপ সার্ব্বদেশিকরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অবিশ্রান্তরূপে, আর কোন যুগে প্রকাশিত হইয়াছে কি না, আমাদের জানা নাই; তবে শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে যে, তাহা মূর্ত্তিমান হইয়া সম্প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বাস্তব প্রত্যক্ষ। শ্রীল গোস্বামিবর্গের কালে, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদি প্রভুত্রয়ের সময়ে, শ্রীল চক্রবর্ত্তী-বলদেবের অভ্যুদয়-যুগে প্রচার-আচার প্রবলভাবে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি যেন যুক্ত-বৈরাগ্যের সার্ব্বদেশিক আচার সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই—প্রচার এরূপ বিপুলভাবে—বিভিন্নভাবে—সমগ্রভাবে হইয়াছিল কি না, তাহাও সম্প্রকাশিত নাই। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগোস্বামিবর্গ ও শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদি প্রভুত্রয়, শ্রীল চক্রবর্ত্তী-বলদেবাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচারানুসরণের সার্ব্বদেশিকতা ও প্রচারানুসরণের পরিশিষ্ট লইয়া শ্রীল প্রভুপাদ যুগপৎ পূর্ণতম ও সমগ্র আচার-প্রচারের সেনাপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব—ষড়্গোস্বামী, শ্রীবলদেবাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচার্য্যলীলার পরিশিষ্টস্বরূপ

শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগোস্বামিবর্গ এবং পূর্ব্ব মহাজন-গণকেই আচার-প্রচারের আদর্শ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যের পুনরুদ্ধার, কোথায়ও বা অপ্রকাশিত কার্য্যের প্রকাশ ও পরিশিষ্টতা সম্পাদন-দ্বারা জগদাচার্য্যত্বের মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামি-মহাজনবর্গের সেবা-তাৎপর্য্য বিষয়ে যাঁহারা অন্ধ, সেই ব্যক্তিগণ এই পরিশিষ্টতা-সম্পাদন-কার্য্যকে অভিনব মনে করিয়া যদি যুগাচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্য প্রণিধান করিতে না পারে, তবে তাহা যে অত্যন্ত দুর্দ্দৈবের পরিপাক, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার পরিশিষ্টতা-স্বরূপ মহৌদার্য্যময়ী গৌরলীলায় যেরূপ অত্যন্ত দুর্দ্দৈব-গ্রস্তগণ মুহ্যমান হয়, তদ্রূপ যদি শ্রীগোস্বামিবর্গের আচার্য্য-লীলার পরিশিষ্ট-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে কেহ মুহ্যমান হয়, তবে তাহার দুর্ভাগ্য আরও অত্যন্ত সমধিক—মায়াদেবীর যন্ত্র-পেষণে পুনঃ পুনঃ পিষ্ট না হইলে

তাহার বা তাহাদের শুভোদয় সুদূর-পরাহত। গোস্বামিবর্গের আচার্য্য-লীলার পরিশিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে প্রকাশিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট ও লীলার সমগ্রতা সাধন করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-নিজজন শ্রীল প্রভুপাদেই যুগাচার্য্যত্ব নিহিত

সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বই—যুগাচার্য্যত্ব, জগদাচার্য্যত্ব। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী, আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া, ঢঙ্গ বিপ্র, আচার্য্যব্রুব, লৌকিক আচার্য্য, শুক্রাচার্য্য, স্বয়ং সিদ্ধ আচার্য্য, গণ-মতের সৃষ্ট আচার্য্য, হঠাৎ আচার্য্য, ঐন্দ্রজালিক আচার্য্য প্রভৃতির অকৃত্রিম আচার্য্যত্ব নাই—সে সকলই ন্যূনাধিক দুরাচারিত্ব। শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনেই আচার্য্যত্বের পূর্ণতমা অভিব্যক্তি—সেই অতিমর্ত্ত্য শোভা-দর্শনের জন্য অবৈধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মৎসরতার পরিবর্ত্তে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিযুক্ত নিরপেক্ষতা বা অধ্যয়ন-প্রবৃত্তির সমিধ্ সমাহরণ করা কর্ত্তব্য।

(১২)
প্রভুপাদ ও সম্বন্ধ-নির্ণয়

সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে চতুর্ব্বিধ শ্রেণী-বিভাগ

সম্বন্ধ-নিরূপণে জগতের অনেক মনীষী, অনেক দেশ-হিতৈষী, অনেক ধার্ম্মিক, পারমার্থিক, লোক-গুরু, আচার্য্য অনেক প্রকার বস্তু-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্বন্ধ-নির্ণায়ক মনীষী ও শিক্ষকগণের মধ্যে সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ শ্রেণী-বিভাগ লক্ষিত হয়—চতুর্ব্বিধ ভূমিকা অবলম্বনে এই শ্রেণী-চতুষ্টয় বিভক্ত হইয়াছে।

১) এক শ্রেণী নিজ-সত্তাকে জড়ের সহিত একীভূত মনে করিয়া অন্য জড়তত্ত্বকে সম্বন্ধ-রূপে স্থাপন করেন;

২) আর এক শ্রেণী জড় ও চেতনাভাসের মিশ্রণে যে জড়তা উপলব্ধি হয়, তাহাকেই নিজ সত্তার পরিচয় বিচার করিয়া চিদাভাসমিশ্র জড়কে সম্বন্ধ-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করেন;

৩) তৃতীয় শ্রেণী অচিৎ ও চিদাভাসের বিক্ষুব্ধাবস্থার সাম্যভাব বা বিরতির সহিত নিজ সত্তার (?) অস্মিতা (?) স্থাপন করেন;

১ম শ্রেণীর লোকগণের ধারণায়—জড়ই নিত্য; জড়গত সমস্ত ধর্ম্মই অনুলোম-বিলোম-ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তদ্রূপই সেই উৎপন্ন চৈতন্য ব্যতিক্রম-যোগে অচৈতন্যতা-রূপ জড়ধর্ম্মে পরিণত হয়। কেবল স্থূলদর্শী এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আত্মার উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজেকে জড়াত্মক বলিয়া বিচার করেন।

২য় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদর্শী, কিন্তু আত্মদর্শী নহেন। তাঁহারা চিদাভাস-তত্ত্ব মন, বুদ্ধি ও অহংকারকে স্থূল জড়শরীরের সহিত মিশ্রণ করিয়াই নিজের সত্তা-রূপে বিচার করেন।

৩য় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ—জড় স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ের অতীত যে ব্রহ্ম, তাঁহাতেই নিজ সত্তা-রূপ আমিত্ব স্থাপন করেন।

৪) চতুর্থ-শ্রেণী নিজ সত্তাকে শুদ্ধচেতনরূপে পরিদর্শন করিয়া পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ চেতনের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হন।

'সম্বন্ধ' বলিতে কি বুঝায়

উপরি উক্ত চতুর্ব্বিধ শ্রেণীর অন্যতম তৃতীয় শ্রেণীতে প্রকৃত-প্রস্তাবে 'সম্বন্ধ' শব্দটী সংলগ্ন হইতে পারে না। কারণ, 'সম্বন্ধ'-শব্দের ধারণা একাধিক বস্তুর অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে। **এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর যে সম্যক্‌রূপ বন্ধন, তাহাই 'সম্বন্ধ'।** তৃতীয় শ্রেণী একাধিক বস্তুর অস্তিত্ব বা বস্তুর অস্তিত্ব মাত্রই স্বীকার করেন না বলিয়া তাহাতে 'সম্বন্ধ'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

'বস্তু'-শব্দের তাৎপর্য্য

জড়-ব্যতিরেক 'ভাব' বা ভাবাভাব মাত্র 'বস্তু' নহে। 'বস্তু' বলিলেই বস্তুর নাম কি? বস্তুর রূপ কি? বস্তুর গুণ কি? বস্তুর ক্রিয়া কি? বস্তুর পারিপার্শ্বিকতা কি?—এই সকল প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ-মীমাংসক কোন সত্তাবান পদার্থের পরিচয় আবশ্যক। যাহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, ক্রিয়া নাই, পারিপার্শ্বিকতা নাই, তাহা আকাশকুসুম-বৎ ভাব বা ভাবাভাব মাত্র।

বস্তুর বস্তুত্ব-প্রমাণে প্রয়োজন—অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় পরিচয়

উপরি-উক্ত তৃতীয়-শ্রেণী কোনও নিত্য নামী, গুণী, রূপী, ক্রিয়াবান্ বা পরিকরযুক্ত বস্তুর সহিত নিজ-পরিচয় করাইতে পারে না—কেবল অনিত্য নামী, গুণী, রূপীর সহিত নিজ ব্যতিরেক পরিচয় করাইয়া থাকে। ব্যতিরেক পরিচয়ের পর তাহার কোনও অন্বয়-পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবল ব্যতিরেক-পরিচয়ে বস্তু নির্ণীত হয় না—অন্বয় ও ব্যতিরেক-পরিচয় সমভাবে থাকিলেই বস্তুত্ব স্বীকৃত হয়। কাজেই উপরি উক্ত তৃতীয়-শ্রেণী প্রকৃত-প্রস্তাবে সম্বন্ধহীন-রূপেই পরিচয় প্রদানে উৎসুক।

উপনিষদে 'সম্বন্ধ'-বিষয়ক বাক্য

কিন্তু শ্রুতির পন্থা—সম্বন্ধের পন্থা। শ্রুতি সম্বন্ধের কথাই কীর্ত্তন করেন—শ্রুতি বলেন,—

"**স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সৌম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তন-মলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইতি।**"

অর্থাৎ, পক্ষী যেমন ব্যাধের হস্তগত সূত্র-দ্বারা বদ্ধ থাকিলে উড়িতে চেষ্টা করিয়াও কোন দিকে যাইতে না পারিয়া শেষে পাদলগ্ন সূত্রের বন্ধন-স্থানেই আগমন করে, তদ্রূপ এই সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী জীবও জাগর-দশায় চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়পথে ধাবিত হইয়াও পলায়ন করিতে না পারিয়া শেষে মুখ্যপ্রাণ পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, কারণ, তিনি মুখ্য প্রাণেই আবদ্ধ আছেন।

বৃহদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী

সম্বন্ধ-হীনতার ন্যায় দুর্দ্দশা আর কিছুই হইতে পারে না। 'সম্বন্ধহীনতা' অর্থে—আশ্রয়-হীনতা। আশ্রয়হীনের পতন অবশ্যম্ভাবী—আশ্রয়হীন বা নিরালম্বের অবস্থান নাই, সত্তা নাই, চেতনতারও সার্থকতা নাই, আনন্দ নাই। যে শ্রেণী সম্বন্ধ-হীনতাকে শ্লাঘ্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, ব্রহ্মই যখন আমি (?), তখন বৃহতের আবার আলম্বন, আশ্রয় দরকার কি? তাহার পতনই বা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু একটুকু সামান্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-দ্বারা দেখিলেও জানা যায়, বৃহদ্বস্তুও ক্ষুদ্রবস্তুর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর, গ্রহ-নক্ষত্রাদির সহিত বিশ্বের, পৃথিবীর সহিত পার্থিব বস্তু-সমূহের পরস্পর সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই প্রত্যক্ষ সত্যটী বুঝিতে পারেন যে, বৃহদ্বস্তুও ক্ষুদ্রবস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই নিজ অস্তিত্বের ঐক্যতান সংরক্ষণ করে। সুতরাং যাঁহারা আপনাদিগকে বা আপনাকে বৃহদ্বস্তু কল্পনা করিয়া শ্রুতিসিদ্ধ 'সম্বন্ধ' শব্দের বা সম্বন্ধময়ী ধারণার প্রতি বিদ্রোহ আনয়ন করেন, তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী—তাঁহারা পতিত, আর তাঁহাদের ঐরূপ যুক্তিও—অস্বাভাবিকী।

সম্বন্ধ' অর্থাৎ 'সম্যক্ বন্ধন'-অর্থের তাৎপর্য্য

'সম্বন্ধ' শব্দের দ্বারা কেবল 'বন্ধ' মাত্র লক্ষ্য করে না। 'বন্ধ' শব্দে—মিলন, আলিঙ্গন, আত্মসাৎ, অঙ্গাঙ্গীভাব প্রভৃতি সূচিত হয়। কিন্তু 'সম্যক্ বন্ধন' বা

'সম্বন্ধ'—উপরি-উক্ত শব্দ-সমূহের দ্বারা যাহা যাহা উদ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহার সুষ্ঠুতা, পূর্ণতা, সমগ্রতা বা সম্যক্ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে।

জড়জগতে সম্যক্ বন্ধন অর্থাৎ সম্বন্ধ অসম্ভব

অনিত্য বন্ধন, আংশিক বন্ধন, অসম্যক্ বন্ধন, অসমগ্র বন্ধন, সাময়িক বন্ধন, ছিন্নতাপ্রবণ বন্ধন—'সম্যক্ বন্ধন' বা 'সম্বন্ধ' নহে। জড়ে জড়ে বন্ধন—অনিত্য বন্ধন, সাময়িক বন্ধন, ছিন্ন হইয়া যায়—এইরূপ বন্ধন। জগতে যে প্রভু-ভৃত্য, সখা-মিত্র, মাতা-পুত্র বা পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন, তাহা অনিত্য বন্ধন—এই বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ। তথাপি যখন আমাদের মনীষা বা মতি জড়ের কর্ম্মালানে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়, তখন আমরা ঐরূপ অনিত্য বন্ধনকেই 'সম্বন্ধ' বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে জড়ীকৃত-মতি এক শ্রেণীর প্রামাণিকম্মন্য ব্যক্তি "*জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী*", "*পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ*", "*শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্*" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য রচনা বা উদ্ধার-পূর্ব্বক জড়ের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের উপদেশক হইয়া জড়সংবদ্ধ জীবের নিকট 'ঋষি' বা 'মহাজন' বলিয়া পরিকল্পিত হন। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইতিহাস অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত করে, এইরূপ জড়-সম্বন্ধ 'সম্বন্ধ'-পদবাচ্য হইতে পারে না—জড়ে জড়ে বন্ধন জীর্ণ হইয়া যায়—ছিন্ন হইয়া যায়। চিদাভাস মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদির সহিত আমাদের সম্বন্ধ হইতে পারে না। চিদাভাস বিভিন্ন বাসনা—সঙ্কল্প-বিকল্প-দ্বারা চালিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পূর্ব্ব সম্বন্ধ ভঙ্গ করে, ইহাও পরিদৃষ্ট সত্য।

শুদ্ধ চেতনে-চেতনেই মাত্র 'সম্বন্ধ'-স্থাপন সম্ভব

কেবল জড়-ব্যতিরেকভাবেও সম্বন্ধ-ব্যাপার অস্বাভাবিক—সম্বন্ধের সম্বন্ধী ও যাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপনীয়, তাহাদের পৃথগ্ অস্তিত্ব সেখানে নাই—সুতরাং সম্বন্ধও তথায় নাই। একমাত্র অবিমিশ্র চেতনে চেতনে সম্বন্ধ হইতে পারে—চেতন যখন পূর্ণ-চেতনের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ আবিষ্কার করে, তখন পারিপার্শ্বিক চেতন অন্বয়-মুখে এক ঐক্যতানের সূত্রে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এইরূপ সম্বন্ধই নিত্য।

মনোধর্ম্মে গঠিত 'কৃষ্ণ' নহে, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'সম্বন্ধে'র বস্তু

এইরূপ সম্বন্ধ-বিচারেও কেহ একল বাসুদেব, কেহ লক্ষ্মীনারায়ণ, কেহ সীতারাম, কেহ দ্বারকেশ, কেহ মথুরেশ, কেহ বা শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সকল লোকশিক্ষকের অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা-বিধায়ক স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র সম্বন্ধতত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। "**জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস**"—শ্রীসনাতন শিক্ষার এই মহাবাক্য অনেকেই মুখে উচ্চারণ করেন, সহস্রবার পাঠ করেন, আলোচনা করেন, বক্তৃতা-মঞ্চে কীর্ত্তন করেন; কিন্তু তাঁহাদের অন্যরূপ আচরণ—তাঁহাদের মৌখিক উপদেশ অধিকাংশ স্থলেই অধোক্ষজ-কৃষ্ণকে সম্বন্ধ-রূপে নির্ণীত না করিয়া ন্যূনাধিক অক্ষজ-কৃষ্ণকে (?) নির্ণয় করে।

যেখানে অধোক্ষজ-কৃষ্ণ সম্বন্ধরূপে নির্ণীত হন, সেখানে কোন জড় বস্তু বা জড়মিশ্র বস্তু ব্যবধানরূপে উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ এমন নিরঙ্কুশ স্বরাট্ বস্তু যে, সেই স্বরাট্ অন্য কোন ব্যবধান বা ভাগীদারের অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারেন না। যেখানে কোন ভাগীদার সম্বন্ধরূপে উপস্থিত হয়, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ স্বরূপকে আবরণ করেন। 'শ্রীকৃষ্ণ' বিষয়টী অন্য কোনও আপাত-সম প্রতিবিষয় (সদৃশ বিষয়) বা প্রতিশব্দের (সদৃশ শব্দের) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারেন না।

শ্রীগৌরকৃষ্ণকেই 'সম্বন্ধ'রূপে স্থাপন করিতে শ্রীল প্রভুপাদের অদ্বিতীয় ভূমিকা

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায়, আচরণে, আদর্শে আমরা এই বিষয়টী দেদীপ্যমান্ দেখিতে পাই। শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধ-নির্ণয়ে একমাত্র অধোক্ষজ গৌরকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই নির্ণয় করেন না। শ্রীল প্রভুপাদের পরিপূর্ণ চেতনতাময় কীর্ত্তন—বিষয়াশ্রয় গৌরকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে সম্বন্ধরূপে স্থাপন করে না। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরকিশোর, প্রকাশবিগ্রহ-শ্রীগৌরকিশোর, স্বয়ংরূপ বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ংরূপ আশ্রয়বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণকে সম্বন্ধরূপে নির্ণয় করিতে

শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য প্রভাব অদ্বিতীয়। শ্রীগৌরকৃষ্ণ ব্যতীতও অপর বস্তু বা অবস্তু সম্বন্ধরূপে নির্ণীত হইতে পারে,—মানবজাতি, তথাকথিত ধার্ম্মিক, পারমার্থিক বা মনীষিগণের এই যে ধারণা—যাহা তথাকথিত সমন্বয়ের পুষ্পিত বাক্যের মধ্যে বিশ্বে প্রচারিত—এই ধারণা বর্ত্তমান যুগে আর কেহ এমন অস্মিতাময় কীর্ত্তনে—জ্বলন্ত আচরণে—বাস্তব আদর্শে—অপ্রতারিত সনাতন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে—অব্যর্থ-যুক্তিতে বিদূরিত করিতে পারেন নাই—ইতর বিষয় চূর্ণ-বিচূর্ণীত করিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণকে একচ্ছত্র সম্বন্ধ-তত্ত্বরূপে স্থাপন করিতে পারেন নাই, যেমনটী আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ করিয়াছেন। তথাকথিত সমন্বয়ের সংক্রামকতা জগতের সকলকেই ন্যূনাধিক আক্রমণ করিয়াছে; কিন্তু ঐরূপ মায়াবীর মায়ার কোন ছায়ামাত্র যাহার অকৃত্রিম দাসানুদাসগণকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই প্রভুবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্বন্ধ-তত্ত্বের সহিত জীবকে ঐরূপ সুদৃঢ়ভাবে সম্যক্ বন্ধন করিয়াছেন। '*একমাত্র পূর্ণতম স্বরাট্ সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যতীত অপর বস্তু বা অবস্তুকেও সম্বন্ধ-রূপে স্বীকার করিলে ক্ষতি নাই, তাহা প্রায় সমানই বা সমজাতীয়ই*'—এরূপ যে একপ্রকার অসম্বন্ধভাব-প্রবণতা, মায়াময়তা—যাহা সম্বন্ধতত্ত্বের পাদপদ্মে সম্যক্ বন্ধনের ন্যূনতা ও বিক্ষিপ্ততাই প্রমাণিত করে, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন—শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম।

প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক 'আশ্রয়বিগ্রহে'র সহিত সম্বন্ধেরই যথার্থতা শিক্ষাপ্রদান

শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধ-শিক্ষার যে আদর্শ, তাহা 'বিষয়'-সম্বন্ধতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ-ছলনার কৈতব অপেক্ষা 'আশ্রয়'-সম্বন্ধতত্ত্বের সহিত অকৈতব সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর দৃঢ়ভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। 'বিষয়বিগ্রহে'র সহিত সম্বন্ধে (?) অনেক সময় সিদ্ধি অনিশ্চিত, কিন্তু 'আশ্রয়বিগ্রহে'র সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে সিদ্ধি সুনিশ্চিত ও করতলগত।✶ আশ্রয়ের সম্বন্ধে যে বিষয়ের সম্বন্ধ, তাহাই বিষয়ের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ; আশ্রয়কে উল্লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করিয়া যে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ, তাহা 'সম্বন্ধ' নহে—বিচ্যুতি।

✶ সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্। নিঃসংশয়োঽস্তু তদ্ভক্তপরিচর্যারতাত্মনাম্॥

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা—'সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধবিশিষ্ট হও'

শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে এইরূপ সম্বন্ধ-শিক্ষাই বিস্তৃত হইয়াছে। সম্বন্ধ-শিক্ষার কথা শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ প্রভাবের সহিত—জোরের সহিত পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এরূপ অন্য কোনও আচার্য্যের শিক্ষায় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। ইহা অর্থবাদ নহে, পুনঃ পুনঃ পরিলক্ষিত সত্য। ভগবদ্ভজন করিতে হইলে 'সম্বন্ধ-শিক্ষা'র কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে—সম্বন্ধ-নির্ণয়ের কোনও আবশ্যকতা আছে—সম্বন্ধ-সংস্থাপনের কোনও অব্যর্থতা আছে, ইহা শত শত শাস্ত্রপাঠ, শত শত লোকের সহিত আলোচনা, শত শত প্রতারিত সাধুর সহিত সঙ্গও হৃদয়ে বদ্ধমূল ধারণা আনিয়া দিতে পারে নাই; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের মূর্ত্তিমতী চৈতন্যবাণী —পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত সনাতন-রূপোপদেশ সেই এক কথারই সুদৃঢ় আবৃত্তি করিয়াছে,—**সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হও**।

সম্বন্ধ-জ্ঞানের মন্ত্র—সম্বন্ধ-জ্ঞানের দীক্ষা—সম্বন্ধ-জ্ঞানের শিক্ষা—সম্বন্ধ-জ্ঞানের আদর্শ—সম্বন্ধ-জ্ঞানের আচার-প্রচার—সম্বন্ধ-জ্ঞানের অনুশীলন—সম্বন্ধ-জ্ঞানের অখিলচেষ্টা, সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভিনিবেশ—সম্বন্ধ-জ্ঞানের অধ্যবসায় এইরূপ জ্বলন্তরূপে আর কেহ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীগুরুদেব দীক্ষা প্রদান করেন—মন্ত্র উচ্চারণ-মাত্র করেন, ইহা প্রচলিত মত; কিন্তু সম্বন্ধ-জ্ঞান অর্থাৎ "**কৃষ্ণব্যতীত বিশ্বের—ত্রিজগতের অন্য কোনও বস্তুর সহিত তোমার বন্ধন নাই—সম্বন্ধ নাই—কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিকভাবে নিখিল বস্তুর সহিত তোমার সম্বন্ধ**"—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র সম্বন্ধজ্ঞান-মূর্ত্তিমতী শিক্ষাই চক্ষে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধজ্ঞান-শিক্ষাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য

জড়ের সম্বন্ধে যে জীবকোটীর অধ্যাস (মিথ্যাজ্ঞান) হইয়াছে, সেই জীবকোটীর নিকট এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আপাত বিপ্লবী। আপাত-বিপ্লবী বলিয়া বিদ্রোহী নয়। কিন্তু জড়-সম্বন্ধে যাহারা অত্যন্ত দৃঢ়মূল, তাহারা তাহাদের সেই মুগ্ধতার (মূঢ়তার) বোধে আত্মার স্বাস্থ্যোদ্ধারকে যেস্থলে 'বিপ্লব' মনে

করিয়া বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করেন, সেস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানের কীর্ত্তনাস্ত্র অপ্রতিহত গতিতে প্রয়োগ হয়। শ্রীল প্রভুপাদের মূর্ত্তিমান আদর্শে বিশেষ অধ্যয়ন করিবার বিষয়—প্রভুপাদ শতকরা শত পূর্ণভাবে কিরূপ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরকিশোর-বিষয়াশ্রয়- বিগ্রহকে 'সম্বন্ধ'; রূপানুগ কীর্ত্তনকে 'অভিধেয়' এবং ভক্তিবিনোদন-কারী অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ পরিপোষক প্রেমাকে 'প্রয়োজন'-তত্ত্বরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনৈক-অভিধেয় শ্রীগৌরকৃষ্ণৈক-সম্বন্ধকে কিরূপে সুদৃঢ় ও সম্প্রকাশিত করিয়া ভক্তিবিনোদৈক-প্রয়োজনকে প্রফুল্ল করে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধজ্ঞান-শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে অধ্যয়নের বিষয়। সেবোন্মুখ চিত্তের প্রত্যক্ষানুভবের এইসকল কথাগুলি নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করিলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিজ্ঞান ও রহস্য উপলব্ধি হইবে।

(১৩)
প্রভুপাদ ও অভিধেয়-নির্ণয়

'সম্বন্ধ'-বিচারের তারতম্যে 'অভিধেয়'-বিচারের তারতম্য

সম্বন্ধ-কেন্দ্রের তারতম্য-অনুসারে 'অভিধেয়ে'র পার্থক্য বিচারিত হইয়াছে। যাঁহারা অচেতন বা চিদাভাসকে সম্বন্ধ-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন অথবা চেতনের অসম্যক্ প্রতীতি বা আংশিক প্রতীতিকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের 'অভিধেয়' স্তব্ধভাব ধারণ করিয়া থাকে। পূর্ণ ও অনাবৃত চেতনে সম্বন্ধ কেন্দ্রীভূত না হইলে অভিধেয়ের প্রফুল্লতা ও সচেতনতা ব্যাপ্ত হইতে পারে না। অভিধা শক্তি সম্বন্ধ্য বস্তুর✶ মুখ্যার্থ বা সহজার্থ প্রকাশ করে। বাচ্য বস্তু আবৃত হইলে উহার মুখ্যার্থ বা সহজার্থ প্রকাশিত হয় না। মুখ্যার্থও বস্তুতঃ গৌণার্থ, সহজার্থও তত্ত্বতঃ কৃত্রিমার্থই সাধন করিয়া থাকে। অতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় এই সুসূক্ষ্ম বিচার ধরিতে না পারিয়া আবৃত ও অনাবৃত উভয়প্রকার বস্তু, দশা বা প্রতীতির অভিধাকে একাকার করিয়া লোকপ্রিয় চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন।

অতত্ত্বজ্ঞ গোষ্ঠীর বিচারে শুদ্ধভক্তগণ 'গোঁড়া'

জগতের যখন শতকরা প্রায় শতজনই আবৃত-দশায় কবলিত, তখন আবৃত-সহজার্থকে (অর্থাৎ দেহ-মনোধর্ম্মকে) আবৃত-বস্তুর (আত্মার) মুখ্যার্থরূপে দর্শন করিতে তাঁহাদের সুবিধাবাদের আপাত ক্ষতি হয় না; কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক অনাবৃত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহাকে মুখ্যার্থ বা সহজার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এজন্য তাঁহারা লোকপ্রিয় হইতে পারেন না—চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর আবৃত-দর্শন, আবৃত-অভিধা ও আবৃত-তত্ত্ববস্তুর বিচারের তৌলদণ্ডে তাঁহারা 'গোঁড়া', 'সাম্প্রদায়িক' প্রভৃতি বলিয়া বিচারিত হন!

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখবিধায়িকা শুদ্ধভক্তিই মাত্র 'অভিধেয়'-রূপে নিণীত

কিন্তু অনাবৃত-সম্বন্ধ্যের অনাবৃত-অভিধা অর্থাৎ পূর্ণচেতনে যাহা কেন্দ্রীভূত সহজার্থ-বিশিষ্ট, তাহা সহজ-সাধন-স্বরূপ একমাত্র নির্ম্মলা-ভক্তি ব্যতীত আর

✶ সম্বন্ধ্য বস্তু—যে-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনীয়।

কিছুই হইতে পারে না। অভিধেয়-নির্ণয়ে এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবত-মূর্ত্তলীল শ্রীগৌরসুন্দর শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিপাদ্য যে অভিধেয়, তাহা বিদ্ধা ভক্তি বা মিছা ভক্তি নহে।

অজ্ঞসমাজে কেবল নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারিণী 'ভক্তি'ই স্বীকৃত

জগতে বিদ্ধা ভক্তি বা মিছা ভক্তিকে অনেকেই 'ভক্তি' মনে করিয়া ভক্তি-যাজনের মৌখিকতা প্রকাশ করেন। তথাকথিত বা প্রচলিত ধর্ম্মজগতে আজকাল খুব কম লোকই আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিতা এবং তাঁহাদের নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কারিণী ভক্তিকে 'অভিধেয়' বলিতে অন্ততঃ মৌখিকভাবে অস্বীকৃত হন। ভাবপ্রবণ বঙ্গদেশে নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কারিণী ভাবুকতাকে 'ভক্তি' বলিতে শতকরা প্রায় শতজন লোকই ন্যূনাধিক কুণ্ঠিত নহেন। একান্ত শুষ্ক-জ্ঞানালোচনা এদেশের জল-কাদার সহিত সমন্বিত হয় না,—একথা এদেশের ভাবপ্রবণগণ ন্যূনাধিক স্বীকার করিয়া তাহাদের স্বকপোল-কল্পিতা ভক্তির (?) চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

'ভক্তি'কে অনেক পন্থার মধ্যে এক পন্থা-রূপে সুবিধাবাদিগণের ধারণা

এইরূপ মত (অর্থাৎ শুষ্কজ্ঞান-বিরোধী মত) অনেকেই আন্তরিকতায় পোষণ করেন এবং তর্কস্থলে বাহ্যে যুক্তি প্রদান করিয়া বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারাও ভক্তি (?) স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা 'একঘেয়ে' 'গোঁড়া' নহেন; ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, সকলই তাঁহাদের মতে সমান; এক একটী উপায়, এক একটী পথ মাত্র; যাঁহার যেটী ভাল লাগে বা সুবিধা হয়, তিনি সেইটী গ্রহণ করিয়া সাধন করিবেন। যেমন কালিঘাটে যাইতে হইলে কেহ নৌকায়, কেহ ষ্টীমারে, কেহ ট্রামে, কেহ পদব্রজে, আজকাল আবার ট্যাক্সি, বাস, মোটর প্রভৃতিতেও যাইতে পারেন। এইরূপে হয় ত' যখন আরও কোন নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইবে, তখন সেই নূতন নূতন সাধনের দ্বারাও সেই স্থানে যাওয়া যাইবে। ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ব্যতীত আরও যদি কিছু উপায়

ভবিষ্যতে সৃষ্ট বা আবিষ্কৃত হয়, তবে ঐ সকল নব উদ্ভাবিত সাধনের দ্বারাও মূল গন্তব্য পথে সকলেই পৌঁছিতে পারিবেন। এইরূপ যুক্তি বিপুলকায়া, মনোহারিণী, বালঘাতিনী পূতনার ন্যায় একদিকে যেমন মাতৃসুলভ স্নেহ-প্রাচুর্য্যের কৃত্রিম মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া লোক-লোচনে নির্ম্মলা ভক্তি বা অনাবৃত-অভিধেয়-তত্ত্বকে আবৃত করিতেছে, অপরদিকে তেমনি স্নেহসিক্ত স্তন্যসুধার বিবর্ত্ত উৎপাদন-পূর্ব্বক বিষম হলাহল পরমার্থ-রাজ্যের শিশু-সন্তানগণের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত করিয়া জগৎ হইতে একান্ত পরমার্থ-যাজকের অস্তিত্ব বিলুপ্তি করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে।

অভিধেয়-নির্ণয়ে শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যে কথা কীর্ত্তন করিলেন, সেই একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিই নির্ম্মল বা অনাবৃত-আত্মার সহজ বৃত্তি—অনাবৃত অভিধেয়—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"
"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥"
"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

[শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—যে-ভক্তির অনুষ্ঠানে এক কৃষ্ণপ্রীতি-বিধানের অভিলাষ ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ থাকে না, যাহা কোন নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান, কিংবা যোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদি ধর্ম্মের দ্বারা আবৃত হয় না, যাহা কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখবিধানের অনুকূল-চেষ্টায় কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনময়, তাহাই উত্তমা ভক্তি।

সমস্ত দেহ-মনোধর্ম্মের বিচাররহিত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীহরির যে-সেবা অনুষ্ঠিত হয়, কেবল কৃষ্ণপরা হওয়ায় যাহাতে কোনরূপ জ্ঞান-কর্ম্মাদি মলের গন্ধ থাকে না, তাহাই উত্তমা ভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত-গোস্বামীর বাক্য—তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম, যাহার অনুষ্ঠানে অধোক্ষজ শ্রীহরিতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির উদয় হয়; তদ্দ্বারাই জীবাত্মা সুপ্রসন্ন হয়।]

স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারী দলের নিকট ভক্তি ও অভক্তি উভয়ই সমান

এই সমস্ত কথাই বহির্ম্মুখ লোকসমষ্টির ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আপাত প্রেয়োরুচি এবং সেই প্রেয়োরুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী নায়কগণের স্বার্থচেষ্টার প্রাবল্যে যেন লোকের বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইল অথবা অধিকাংশ স্থলে তাহা সঙ্কীর্ণতা-দ্যোতক বাক্য বা 'অর্থবাদ' বলিয়া পরিগণিত হইল। মাতালের দল বা ব্যভিচারি-সম্প্রদায় যেমন মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন বা ব্যভিচারের প্রতিকূল উপদেশকে 'সঙ্কীর্ণতা', 'গোঁড়ামী', 'অনুদারতা' বলিয়া প্রচার করে, আর লোকপ্রিয়তার গ্রাহক-সম্প্রদায়ের নায়কগণ যেমন প্রচ্ছন্ন-ব্যভিচারী ও স্পষ্ট-ব্যভিচারী উভয় দলেরই প্রিয়তা অর্জ্জন করিবার জন্য ব্যভিচার ও অব্যভিচার উভয়ই সমান বলিয়া প্রচার করেন, অর্থাৎ উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট রাখিয়া নিজ জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ-রূপ কাম্যবস্তু সংগ্রহ করেন, সেইরূপ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায়ের নায়কগণও ভক্তি (?) ও অভক্তি উভয়ই সমান বলিয়া স্থাপনের বা প্রচারের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন! ব্যভিচার ও অব্যভিচার উভয়ই সমান—এই কথায় ব্যভিচার-সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হন; আর সন্তুষ্ট হন তাঁহারা—যাঁহাদের মৌখিকতায় অব্যভিচারের সমর্থন আছে, কিন্তু অন্তরে ব্যভিচারের পক্ষেই সহানুভূতি। জগতে এরূপ দুই সম্প্রদায়ই প্রবল।

স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারী দলের স্বরূপ

কিন্তু একান্ত অব্যভিচারী ব্যক্তি ঐরূপ আপাত মধুপুষ্পিত কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। উপরি-উক্ত সম্প্রদায়-দ্বয়ের মধ্যে তাঁহাদের স্থান নাই, তাঁহারা উঁহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ, স্পষ্ট-ব্যভিচারী ও প্রচ্ছন্ন-ব্যভিচারী উভয়েই ব্যভিচারী; তফাৎ, একজন প্রকাশ্য ব্যভিচার করেন, আর একজন লোকলোচনে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া গোপনে অন্তরে ব্যভিচার করেন।

জগতের প্রচলিত বা তথাকথিত ভক্তি-স্বীকারকারী ব্যক্তিগণ ঐ দুই শ্রেণীর ব্যক্তির ন্যায়। একশ্রেণী—যাঁহারা ভক্তির অত্যন্ত ব্যভিচার সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত 'সঙ্কীর্ণ', 'অনুদার', প্রভৃতি বলিয়া নিজ-দিগকেই উদার মনে করেন। অপর শ্রেণী—যাহারা ব্যভিচারের অবিরুদ্ধ-বাদী কিংবা ঐকান্তিকভাবে অকৃত্রিম অব্যভিচারকে সমর্থন না করিয়া সমন্বয়বাদী অর্থাৎ বস্তুতঃ প্রকারান্তরে "*মৌনং সম্মতিলক্ষণং*" ন্যায়ানুসারে ব্যভিচারকেই সমর্থন করেন। ব্যভিচারি-দল এই উভয় শ্রেণীকেই অনিন্দক, পরমোদার বলিয়া অভিনন্দন প্রদান করেন! কিন্তু চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর ঐরূপ হেত্বাভাস-পূর্ণা, বালমনোহারিণী, বহির্ম্মুখ-গণরঞ্জনকারিণী দুর্ব্বলা যুক্তি ও অভিসন্ধি দ্বারা সত্যের পরম সবল পক্ষ বিপর্য্যস্ত হয় না।

অভক্ত-সম্প্রদায়ের যাবতীয় লক্ষ্য ও চেষ্টাই বিপরীত-মুখী

কালিঘাট যাইবার বিভিন্ন উপায়ের দৃষ্টান্তে জড়মায়া যে-বঞ্চনা করে, যে-বিবর্ত্ত উৎপাদন করে, তাহাতে বাস্তব সত্যের উপাসকগণ পতিত হন না। কালিঘাট যদি পূর্ব্বদিকে থাকে, আর বিভিন্ন যানে আরোহণ করিয়া লোকসঙ্ঘ যদি ক্রমাগত পশ্চিমদিকে চলিতে থাকেন, তবে কি উহারা কালিঘাট হইতে ক্রমাগতই দূরে নীত হইবেন, না কালিঘাটে পৌঁছিবেন? যাঁহারা অভক্তিমার্গ-সমূহ—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি অভক্তি-উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন যানারোহণে বা পদব্রজে খুব চলিলেও পশ্চিম দিকেই চলিতেছেন—যত চলিতেছেন, পূর্ব্বদিক তাঁহাদের নিকট হইতে তত দূরে সরিয়া যাইতেছে। অভক্ত-সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই—সম্বন্ধ-নির্ণয়েই পশ্চিমদিককে লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়া চলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের যত চেষ্টা, সব অভক্তি চেষ্টা অর্থাৎ পূর্ব্বদিক হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে।

শুদ্ধভক্তগণ ও অভক্ত-গোষ্ঠীর গন্তব্যস্থল কখনই এক নহে

আর একান্ত অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বপ্রথমেই পূর্ব্বদিককে সম্বন্ধ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার যাবতীয় অভিলাষ, যাবতীয় কর্ম্ম, যাবতীয় জ্ঞান, যাবতীয়

যোগ, তপঃ, ব্রত সকলই যেন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার সাধক বা সহায়ক হইয়াছে। অন্যাভিলাষী, ফলভোগী কর্ম্মী, নির্ভেদজ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ-যোগীর 'গোড়ায়ই গলদ' রহিয়াছে—কালিঘাট যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে—ভুলদিক্ ধরা হইয়াছে—সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারেই ভ্রম রহিয়াছে, কাজেই ঐরূপ দিগ্‌ভ্রান্ত বা বিবর্ত্তগ্রস্ত ব্যক্তি যে-সকল সাধন বা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কালিঘাট পৌঁছাইবার সম্ভাবনা কোথায়? ঐরূপ দিগ্‌ভ্রান্ত যাত্রী যে-কালিঘাটে পৌঁছায়, সেখানে জড়মায়ার নৃত্য—ছায়াশক্তির নৃত্য—ইন্দ্রিয়-তর্পণের তাণ্ডব। ভগবদ্ভক্ত ঐরূপ ছায়া-শক্তির নাট্যের দ্বারা পরিচালিত হন না। ভগবদ্ভক্তকে চিৎশক্তি সর্ব্বদা পরিচালিত করেন—কাজেই তাঁহার বিবর্ত্ত বা দিগ্‌ভ্রম হয় না।

ভক্তের সাধন ও সাধ্য এক বলিয়া ভক্ত অভ্রান্ত; তদভাবে অভক্তগণ চিরভ্রান্ত

তাঁহার দিগ্‌ভ্রম না হইবার আর একটী কারণ,—তিনি যে-সাধন বা উপায় গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার সাধ্য বা উপেয়। সাধন একটী, আর সাধ্য অন্য একটী হইলে দিগ্‌ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু সাধন ও সাধ্য একবস্তু হইলে তাহাতে আর দিগ্‌ভ্রম কিরূপে হইবে? কালিঘাটের যাত্রী যে-নৌকায় আরোহণ করিয়া কালিঘাট পৌঁছিতে চাহেন, সেই নৌকা কিছু কালিঘাট নহে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সম্বন্ধে সেইরূপ নহে—তিনি যে-যানে আশ্রয় করেন, সেই যানেই তাঁহার গন্তব্যসীমা রহিয়াছে; সুতরাং সেখানে ভ্রম হয় না। সুদক্ষ কর্ণধারের যান আশ্রয় করিলেই তাঁহার উপেয় লাভ করতলগত হইল। ভগবদ্ভক্তের পথ ও সীমায় ভেদ নাই—পথ সীমা পর্য্যন্ত সংলগ্ন—সীমা হইতে পথ পৃথক্ নহে, পথ হইতেও সীমা পৃথক্ নহে। পথ স্পর্শ করিতে পারিলেই সীমা স্পর্শ হয়—কেবল স্তরভেদ, এই মাত্র। কিন্তু অভক্তিপথের সম্বন্ধে তাহা নহে—অভক্তিপথে হাটিতে হাটিতে যে সীমা পাওয়া যায়, তাহা পথ হইতে ভিন্ন। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ—একটী পথ, ঐ পথগুলি সীমা নহে অর্থাৎ কর্ম্ম-পথের পথিক যে-রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন, ফলপ্রাপ্তিতে তিনি

সেই যজ্ঞ-শ্রম আর অভিলাষ করেন না; জ্ঞানপথের পথিক যে জ্ঞানালোচনা করিলেন, তাহার ফল-প্রাপ্তিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব সংরক্ষণ হয় না; অষ্টাঙ্গযোগী ফলকালে আর আসন-প্রাণায়ামাদিকে সাধ্য বলিয়া বিচার করেন না। সুতরাং তাঁহাদের পথ, সীমার সহিত সংলগ্ন বা একবস্তু নহে—পথ ও সীমার মধ্যে খুব বড় ব্যবধান আছে—তাঁহারা পথকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া 'সীমা' লাভ করিতে চাহেন। সাধক প্রতীক-উপাসনারূপ পথ ধরিলেন, সেই প্রতীককে চূর্ণ-বিচূর্ণ বা বিসর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত সাধকের সিদ্ধিই কল্পিত হইল না। অভক্তিমার্গে এইজন্য পথ ও গন্তব্য সীমায় সম্পূর্ণ ভেদ আছে—উপায় ও উপেয়ে ভেদ আছে—সাধন ও সাধ্যে ভেদ আছে। কাজেই সেখানে দিগ্‌ভ্রম হয়। কিন্তু ভক্তিপথে উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য একবস্তু হওয়ায় একবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলে চক্ষু মুদ্রিত✶ করিয়াও গন্তব্য সীমায় পৌঁছান যায়—তাহাতে বিপরীত দিকে যাইবার আর উপায় নাই। সেই ভক্তিপথে যে-সকল বিভিন্ন উপায়—চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ প্রভৃতি আছে, তাহাদিগকেই এক গন্তব্য পথের ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল উপায়গুলি অভক্তি-পথের কল্পিত উপায়ের ন্যায় উপেয় হইতে ভিন্ন নহে।

অভিধেয়-নির্ণয়ে মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক তুলনামূলক উপদেশ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন-শিক্ষায় এইসকল কথা জগজ্জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"বাপের ধন আছে জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহাঁ যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধনে হাত না পড়য়॥

✶ যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৫)।

উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজগরে।
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁ'রে ভজি॥
অতএব ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র্যনাশ, ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩১-১৪২)

পূর্ব্বদিকেই মাত্র সূর্য্যোদয়ের ন্যায় শুদ্ধভক্তিযোগেই মাত্র ভগবৎপ্রাপ্তি

পৈত্রিক সম্পত্তি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত আছে জানিলেই ধন করতলগত হয় না। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই তাহার প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বা পথ বলিয়া দিতে পারেন। যে-কোন স্থান খনন করিলেই সম্পত্তি লাভ হইবে—সব স্থানই সমান—সকলই মৃত্তিকা—এরূপ বিচারক-গণ কখনই সে-সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন না। অসর্ব্বজ্ঞ সম্প্রদায় ঐরূপ উক্তি দ্বারা লোকবঞ্চনা করিতে পারেন, কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি একায়ন পদ্ধতির কথা বলেন। সত্যের দিক্ বহু নহে—সত্যসূর্য্য একমাত্র পূর্ব্বদিকে উদিত হন। সকলই যখন দিক্, তখন পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—সবদিকেই সূর্য্য উদিত হইবে—এরূপ গায়ের জোরের বিচার লোক-প্রীতিকর হইলেও তাহা বাস্তব সত্য নহে। পূর্ব্বদিক ব্যতীত অন্য

কোনও দিকে সূর্য্যের উদয় সম্ভব নহে। পশ্চিম দিকে তুমি যতই উপায়, কৌশল, শক্তি, মনীষা লইয়া সূর্য্যের উদয়াচল আবিষ্কার করিতে যাও, তাহা ব্যর্থ হইবে—তোমার পরিশ্রম মাত্র সার হইবে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি পথ সূর্য্যের উদয়াচল নহে—সত্যসূর্য্য ঐ সকল দিকে উদিত হন না—একমাত্র পূর্ব্বদিকে—প্রাচীন, সনাতন, শ্রৌতপথ যাহা, সেই ভক্তিপথে সত্যসূর্য্য উদিত হন। পূর্ব্বদিকেই সেই পৈত্রিক সম্পত্তি—আমাদের শ্রৌত-পরম্পরা-প্রাপ্ত সনাতন ধন পাওয়া যায়—অল্প খনন করিলেই অতি সহজেই সেখানে বস্তু লাভ হয়। আর কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি মার্গে বহু আয়াসেও বস্তু লাভ হয় না—বস্তুর ছায়াই বস্তু বলিয়া বিবর্ত্ত উৎপাদন-পূর্ব্বক আমাদিগকে তুষাবঘাত-কার্য্যে (বৃথা পণ্ডশ্রমে) নিযুক্ত করে।

দক্ষিণা-মার্গ বা কর্ম্মমার্গে ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব

পূর্ব্বদিকও দিক্, দক্ষিণদিক্‌ও দিক্—উভয়ই সমান, এই মনে করিয়া যদি কেহ সূর্য্য দেখিবার জন্য দক্ষিণদিকে খুব চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার কস্মিন্‌কালে অরুণোদয়-দর্শন হইবে না। দক্ষিণদিকে—দক্ষিণা-মার্গে অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে কখনও শ্রৌতসম্পত্তি—পৈত্রিক ধন পাওয়া যাইবে না—অধিকন্তু ভীমরুল, বরুলীর ভীষণ দংশনে, পাপ-পুণ্যের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতে হইবে। শ্রুতিও বলেন যে, কর্ম্ম-দ্বারা কখনও নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না।

পশ্চিম-মার্গী অভক্তি-যোগমার্গের কুফল

পশ্চিম দিক্—পূর্ব্বদিকের ঠিক বিপরীত; পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হন, পশ্চিম দিকে অস্তমিত হন, পূর্ব্বদিকে গমন করিলে সূর্য্যোদয় দেখা যায়, আর পশ্চিম দিকে সূর্য্যাভাব বা সূর্য্যাস্ত লক্ষিত হয়। কৃষ্ণসূর্য্য—সত্যসূর্য্য ভক্তিযোগ-পথরূপ পূর্ব্বদিকে উদিত হন, আর কৃষ্ণ-সূর্য্য বা সত্য-সূর্য্যের অভাব ও অস্তমিত অবস্থা লক্ষিত হয়—অভক্তি-যোগপথে। যোগপথে—কল্পিত ঈশ্বরকে কখনও কখনও বিকল্পে স্বীকার করা হইলেও ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ সিদ্ধি-দশায় ঈশ্বরসূর্য্য অস্তমিত হইয়া পড়েন। সেই পশ্চিম দিক্—অভক্তি-

যোগমার্গ; সেখানে যদি শ্রৌতধনের জন্য মৃত্তিকা খনন করা হয়, তাহা হইলে ধন পাওয়া যায় না, বিভূতিপাদের যক্ষ সেখানে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া ধনকে আবৃত করিয়া রাখে, ধন হস্তগত করিতে দেয় না। কিংবা যক্ষ 'ঈশ্বর-সাযুজ্যে'র লোভ দেখাইয়া জীবের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে।

উত্তরা-পথ বা জ্ঞানমার্গে শ্রৌত-ধন লাভ অসম্ভব

উত্তর দিক্—দিক্ বটে, সেখানে অরুণোদয় হয় না। উত্তর দিক্, দক্ষিণ দিকের প্রতিযোগিণী দিক্। কর্ম্মমার্গ—দক্ষিণ দিক্, দক্ষিণমার্গের প্রতিযোগী উত্তরাপথ—নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানমার্গ। কর্ম্মীর সহিত জ্ঞানীর আপাত প্রতিযোগিতা। কর্ম্মী বলিতেছেন,—"আমি ভোগ করিয়া বাহাদুর", জ্ঞানী বলিতেছেন,—"আমি ত্যাগ করিয়া বাহাদুর"। কর্ম্মী বলিতেছেন,—"আমি কোটি গ্যালন সোমরস পান করিতে পারি"। জ্ঞানী বলিতেছেন,—"আমি শতবৎসর নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকিতে পারি।" এইরূপ ভোগ ও ত্যাগের প্রতিযোগিতামূলক বাহাদুরী—উভয়ই বাহাদুরী—বস্তুতঃ উভয়ই সমজাতীয় অর্থাৎ এই উভয় দিকেই সত্যসূর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না; কিন্তু আপাত-দর্শনে প্রতিযোগী অর্থাৎ একটী দক্ষিণ, আর একটী উত্তর। এই উত্তরাপথে কৃষ্ণ-অজগর আছে। অজগর বড় তাপস, অপ্রতিগ্রাহী, কাহারও কাছে কিছু চাহিতে যায় না—খুব ত্যাগী—যাহা হইতে 'অজগর-বৃত্তি' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু কোন জীবজন্তু পাইলেই আস্ত গিলিয়া ফেলে—জীবকে গ্রাস করে। জীবত্বরূপ সত্তাকে ঐ উত্তরাপথের কৃষ্ণ-অজগর সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলে! 'অজগর-বৃত্তি'-রূপ ত্যাগীর পোষাক গ্রহণপূর্ব্বক—"*কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ*" প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক যাঁহারা জীবত্বকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা কখনও পৈত্রিক সম্পত্তি—শ্রৌতধন লাভ করিতে পারেন না।

ভক্তিই একমাত্র 'অভিধেয়'; অভিধেয়-শব্দের অর্থ

কিন্তু পূর্ব্বদিকে—শ্রৌত সনাতনপথে—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ময়ী বিশুদ্ধ ভক্তিপথে সেই পৈত্রিক সম্পত্তি—জীবের নিত্যস্বরূপ, নিত্য অধিকার—ভগবৎপ্রেমা লাভ হয়। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রে

'অভিধেয়' বলিয়া কীর্ত্তিত। অভি—'ধা' ধাতুর দ্বারা 'অভিধা'-শব্দ নিষ্পন্ন। অভি—সর্ব্বতোভাবে, ধা—ধারণে; অতএব 'অভিধা' বলিতে সর্ব্বতোভাবে ধৃত হয় যাহার দ্বারা, বুঝায়। ভক্তি সমগ্রভাবে আত্মার সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-তত্ত্বকে ধারণ করিতে পারে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-রূপ সম্বন্ধ্য (সম্বন্ধের বিষয়) ও প্রেমা-রূপ প্রয়োজনকে ধারণ করিতে পারে না। 'অভিধেয়'-শব্দের অর্থ—বাচ্য, প্রতিপাদ্য। ভক্তিই—বাচ্য, প্রতিপাদ্য বিষয়—আত্মার নিত্য বাচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়; ইহা ছাড়া অন্য কিছুই আত্মার বাচ্য হইতে পারে না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—আত্মার বাচ্য বা প্রতিপাদ্য হইতে পারে না; কারণ, উহাদের কেহই আত্মার অবিকৃতাবস্থা বা নিত্য অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে না।

ভক্তিমার্গে 'অভিধেয়'ই 'প্রয়োজন'

'অভিধেয়'-শব্দের অপর এক অর্থ—'নাম'। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—অভক্তিমার্গে 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' পৃথক্—'বাচ্য' ও 'বাচক' পৃথক্। কিন্তু ভক্তিমার্গে 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন', 'বাচ্য' ও 'বাচক'—পৃথক্ নয়। ভক্তিপথে অভিধেয়ই (নাম, বাচ্য)—অভিধেয়। অসর্ব্বজ্ঞ-সম্প্রদায় ইহা জানেন না। সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ যাঁহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি পথ ও ভক্তিপথ—সকল পথকেই সুষ্ঠু দর্শন করিয়াছেন—যাঁহারা প্রয়োজনতত্ত্বের সীমায় পৌঁছিয়াছেন—যাঁহারা সম্বন্ধের ভূমিকায় নিত্য সংলগ্ন আছেন, সেই সকল সর্ব্বজ্ঞ ভাগবত-সম্প্রদায় একমাত্র ভক্তিকেই অভিধেয়-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন।

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর 'ভক্তি' ও অভক্তিকে একাসনে স্থাপনদ্বারা অজ্ঞলোকের বিভ্রান্তি-উৎপাদন

সর্ব্বজ্ঞ-সম্প্রদায়ের এই শিক্ষা, এই সনাতন পথ—যে-পথে—যে- দিকে সত্যসূর্য্য চিরন্তনকাল উদিত হন, সেই পূর্ব্বদিক্—সেই শ্রৌত সিদ্ধান্তের কথা জগতে অধিকাংশস্থলে মৌখিকতায় এবং অন্তরে গোঁজামিল দেওয়া আত্মবঞ্চনায় বিকৃতভাবে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান,

যোগাদি অভক্তি-চেষ্টা যে-অনাদি-বহির্ম্মুখ জগৎকে অজগরের ন্যায় গ্রাস করিয়াছে, সেই সকল অভক্তির বিষে যে-জগতের আনখকেশাগ্র, এমন কি, অন্তরমজ্জা পর্য্যন্ত অনুলিপ্ত ও জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই জগতে জগৎ-অতীতা জগন্মঙ্গলকারিণী ভক্তিকেও সেই বিষের প্রভাবে প্রভাবিত করিবার অবৈধ-চেষ্টা উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। ঐরূপ অবৈধ চেষ্টাই চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর কার্য্য। ভক্তির অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা কেন থাকিবে, ভক্তিকেও অভক্তির সহিত সমান আসনে টানিয়া আনিয়া 'অভক্তি'রই সমান 'ভক্তি'—'অভক্তি'রই ন্যায় আর একটি উপায় 'ভক্তি',—এইরূপ প্রচার করিব, ইহাই হইল অভক্তি-পথের পথিকগণের একান্ত চেষ্টা। চোর—সাধুকে, মাতাল—সংযত ব্যক্তিকে তাহার দলে টানিয়া আনিয়া গোষ্ঠীবর্দ্ধন করিতে চাহে, আবার সাধুও—চোরের চৌর্য্যবৃত্তি, সংযত ব্যক্তি—মাতালের মাতলামি ছাড়াইয়া গোষ্ঠী বর্দ্ধন করিবার ইচ্ছা করেন। এই গোষ্ঠী-বর্দ্ধন স্পৃহা আমাদের একটী স্বাভাবিকী বৃত্তি। কিন্তু এখানে চোর-সম্প্রদায় সাধুগণের ঐরূপ সৎস্বার্থপর চেষ্টাকে তাহাদের অপস্বার্থপর চেষ্টার সহিত বাহ্য সৌসাদৃশ্যের উদাহরণ দেখাইয়া অজ্ঞ লোকের বিচার-বিবর্ত্ত-উৎপাদনপূর্ব্বক সাধুগণের চেষ্টাকেও তাহাদেরই ন্যায় অপস্বার্থ-পর সাম্প্রদায়িক চেষ্টারূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, অর্থাৎ উভয়েই যখন স্বার্থপরা চেষ্টা, তখন উভয়ই সমান—এরূপ একটা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের ধূয়া গান গাহিয়া থাকেন।

অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটে ভাগবতীয় গীতির পুনর্জ্জাগরণ

অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত যে গান গাহিয়াছেন,—শ্রীমদ্ভাগবত-মূর্ত্তলীল শ্রীগৌরসুন্দর যে-গানের অব্যভিচারিণী রাগিণী শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের দ্বারা জগতে বিস্তার করিয়াছেন,—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়—"**কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥**" প্রভৃতি যে-গীতির ঝঙ্কারে গৌড়দেশ ভাসাইয়াছেন, শ্রীল চক্রবর্ত্তী

শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ শ্রীবলদেব প্রভু যে-গীতির ভাষ্য-বিবৃতিতে পারমার্থিক বিশ্ব মুখর করিয়াছেন, সেই গীতি যখন নানাবিধ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের ভেক-কোলাহলের দ্বারা আবৃত হইয়া লোক-কর্ণকে বধির করিয়া দিয়াছিল—অবিমিশ্র বৈকুণ্ঠসঙ্গীত-সুধালহরী গ্রহণে যখন লোক-কর্ণ কুণ্ঠিত-কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল—মায়ামরুমল-মিশ্রিতা আপাত-কর্ণসুখ-সঞ্চারিণী মায়াব্যাধ-গীতিই যখন গণকর্ণ-তোষিণী বলিয়া অভ্যর্থিত হইতেছিল—এমন সময় বিলুপ্ত-স্মৃতি জনমণ্ডলীর নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভাগবতী গীতির পুনরাবৃত্তি করিলেন। সেই পুনরাবৃত্তি অধিকাংশ স্থলে অর্চ্চার ন্যায় তাঁহার ভাগবত-গ্রন্থমালা-মন্দিরে যেন 'শয়ন' লাভ করিয়া থাকিলেন—অর্চ্চাকে পূজা করিবার অকৃত্রিম অর্চ্চক, উপাসক খুব কমই পাওয়া গেল—কারণ, ''**হাটে না বিকায় চাউল**।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরই সাক্ষাৎ আদেশ ও প্রেরণাক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সেই শ্রীবিগ্রহকে জাগরিত করিলেন—মূর্ত্তিমতী ভাগবত-পুনরাবৃত্তি-গীতি ভারতের দ্বারে দ্বারে—পৃথিবী পর্য্যন্ত যত দেশ, গ্রাম,—সর্ব্বত্র, চেতনময়ী রাগিণীতে, প্রাণময়তার ঝঙ্কারে, জীবন্ত আচার-প্রচার-আদর্শের ঐক্যতানে, বিস্তার করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর, সমগ্র জগতের সমস্ত ভেককোলাহল-সম ইতর সঙ্গীত নিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের উচ্চ ঢক্কা বাদ্যের ন্যায় শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়ির উচ্চরবে স্তব্ধ করিয়া, আবৃত করিয়া, কর্ম্ম-গয়াসুরের তাণ্ডব গদাধরের পাদপদ্মের দ্বারা বিলুপ্ত করিবার ন্যায় অবিদ্বদ্রূঢ়ির যাবতীয় তাণ্ডব বিদ্বদ্রূঢ়ির তাণ্ডবিনী রতি-নৃত্যের দ্বারা বিলুপ্ত করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীঅভিধেয়-মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইলেন।

অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের সান্নিধ্যে আগত শ্রদ্ধালু বা বিদ্বেষী সকলেরই অভিধেয়-যাজন

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক চিন্ময় অক্ষ প্রত্যক্ষ, প্রত্যেক মুদ্রা, প্রত্যেক আচার-ব্যবহার, প্রত্যেক আদর্শ, প্রত্যেক বিভাব, অনুভাব, প্রত্যেক বেশ,

আবেশ—অভিধেয় কলার নবনবায়মান সৌষ্ঠব-বিস্তারক। এই সকল কথা অসম্পূর্ণা, দুর্ব্বলা ভাষায় কতদূর প্রকাশিত হইবে—ভাষায় প্রকাশিত হইলে লোকে কতদূর বুঝিবে, অনুভব করিতে পারিবে, জানি না। তবে ইহা বাস্তব প্রত্যক্ষ যে, শ্রীল প্রভুপাদ অভিধেয়-মূর্ত্তি। সেই অতিমর্ত্ত্য অভিধেয়-মূর্ত্তির সংস্পর্শে আসিলে যিনি যেরূপ যোগ্যতায়, যেরূপ অবস্থানে, যেরূপ স্বভাবেই থাকুক না কেন, তাঁহাকেই সেই যোগ্যতা, সেই অবস্থান, সেই স্বভাব লইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অভিধেয়ের কিছু না কিছু আনুকূল্য করিয়া ফেলিতে হইবে।

প্রাকৃত চিকিৎসা-শাস্ত্রেও দেখিয়াছি, অপ্রাকৃত চিকিৎসা-শাস্ত্রেও সদ্‌বৈদ্যের লক্ষণে পাইয়াছি, সদ্‌বৈদ্যের স্বভাব এই যে,—তিনি অনভীপ্সুকে জোর করিয়া তিক্ত ঔষধ সেবন করান—নানা কলে, কৌশলে ঔষধ পান করাইয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের স্বভাবে কেবল ইহাই প্রত্যক্ষ হয় না—শ্রীল প্রভুপাদের প্রভাবে, শ্রীল প্রভুপাদের সংস্পর্শে—সান্নিধ্যমাত্রে নিতান্ত অনভীপ্সুরও কোনও না কোনও ভাবে অভিধেয় যাজন করিয়া ফেলিতে হয়।

স্পর্শমণির সমীপে উপনীত হইলে যেরূপ লোহা সোণা হয়, সেরূপ ইহা প্রত্যক্ষ যে, অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া যিনি যতটুকু তাঁহার গাত্রের কর্দ্দমরাশি অনাবৃত করেন, তিনি সেই পরিমাণে সদ্য সদ্য স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। অনেক সময় স্পর্শমণির সান্নিধ্যেও অনেক মলিন লৌহ স্বর্ণতা-প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এইটীই অচিন্ত্য প্রভাব যে, তাঁহার সান্নিধ্য-প্রাপ্ত যিনি যতই মলিন থাকুক্ না কেন, প্রত্যেককেই অন্ততঃ কমবেশী অভিধেয়-সুকৃতি সঞ্চয় করিতেই হইবে। অভিধেয়-মূর্ত্তি অনুরাগী জনের দ্বারা অভিধেয় যাজন করাইতে পারেন—অনভীপ্সুর দ্বারাও অভিধেয় সাধন করাইতে পারেন; শ্রীল প্রভুপাদ সেবোন্মুখের দ্বারা অভিধেয় সাধন করাইতে পারেন, আবার বহির্ম্মুখ এমনকি, বিদ্বেষীর দ্বারাও তাহার অজ্ঞাতসারে অভিধেয়-সুকৃতি সঞ্চয় করাইয়া তাহার নিত্য মঙ্গল উদিত করাইতে পারেন। অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদ অভিধেয়ের এমন এক অতিমর্ত্ত্য চক্রজাল নির্ম্মাণ

করিয়াছেন যে, যে-দিকে যাও না কেন, তাহা এড়াইবার উপায় নাই—তুমি যত বিমুখ হও না কেন, ছাড়াছাড়ি নাই, তোমাকে কিছু না কিছু অভিধেয় স্পর্শ করিতেই হইবে—অভিধেয়-সুকৃতির অন্ততঃ একটী কণ তোমাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। আমরা পারমার্থিক ইতিহাসে—অনেক আচার্য্যের জীবনীতে নাস্তিক, পাষণ্ড, মায়াবাদী, বিদ্ধ শাক্ত, পৌত্তলিক, কর্ম্মজড়, কুযোগী, বহুদেবোপাসক, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারাবলীর উপাসক মর্য্যাদা-পথের পথিক-গণের একান্ত কৃষ্ণভক্তি আশ্রয়ের এক একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই; কিন্তু অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য প্রভাব এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির —ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "**কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র**"—গানের প্রতিপাদ্য কতপ্রকার বিচিত্র ব্যক্তিকে যে ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তির সার্থকতা তাঁহাদের সার্ব্বকালিক জীবনে উপলব্ধি করাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই—কেবল তাঁহাদের জীবনের এক-একটী ইতিহাস বর্ণনা করিতে গেলে এক একটী বৃহদ্ গ্রন্থাগার প্রস্তুত হইয়া পড়ে। কত লোক যে এই অতিমর্ত্ত্য অভিধেয়-শ্রীমূর্ত্তির চেতনময়ী-বাণীতে লক্ষ লক্ষ জন্মের অন্যাভিলাষাগ্রহিতা, কর্ম্মাগ্রহিতা, জ্ঞানাগ্রহিতা, কুযোগাগ্রহিতা, পাষণ্ডতাগ্রহিতা বিসর্জ্জন দিয়া সেই স্থানে অবিসর্জ্জনীয়া, নিত্যারাধ্যা, চিন্ময়ী কৃষ্ণভক্তি-অভিধেয়-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে শত শত প্রবন্ধের প্রয়োজন। এইসকল প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা—বুজ্‌রুগ্‌দের ভূত দেখাইয়া লোক-সংগ্রহ বা গণেন্দ্রিয়-তোষণময়ী জড়-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতাকে সাধুত্বের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাইবার কুমতলব নহে।

'অভিধেয়-শ্রীরূপ—শ্রীল প্রভুপাদ',
এরূপ অধ্যয়নকারীর রূপানুগত্ব লাভ

শ্রীল প্রভুপাদ মুহূর্ত্তেও এমন কার্য্য করেন না—এমন মুদ্রা প্রদর্শন করেন না—এমন আচরণ দেখান না—এমন কিছু উপদেশ করেন না, যাহা পূর্ণতম-রূপে—শতকরা শত পরিমাণরূপে কৃষ্ণানুশীলনের পরিপুষ্টি না করে। ইহা সাজান কথা নহে—কৃত্রিমকে কলমের মধ্যে—মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যে রঞ্জিত করিয়া

অকৃত্রিম করিয়া তোলারূপ আধুনিক তথাকথিত পারমার্থিক ইতিহাসের ছবি নহে—ইহা প্রত্যক্ষ, বাস্তব প্রত্যক্ষ, একান্ত প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষাদপি প্রত্যক্ষ, চেতনের সুলক্ষিত সত্য—সত্য—সত্য। হে সত্যানুসন্ধিৎসু, হে অকৃত্রিম নিরপেক্ষ, হে অবঞ্চনাকামী আত্মমঙ্গল প্রয়াসিন্, যদি অনাবিল, অবিমিশ্র, অকৃত্রিম অভিধেয়ের যাজনের লালসা থাকে—যদি কোথায়ও অনাবৃত অভিধেয়-শ্রীর রূপ দর্শন করিতে চাও, তবে তুমি বাজাইয়া লইতে পার—তোমার পূর্ব্বাভিজ্ঞান-কুসংস্কার মলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষণ করিয়া অকৃত্রিম নিরপেক্ষতার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তির সদ্দর্পণে যদি অনাবৃত ও অকৃত্রিম অভিধেয়ের আদর্শমূর্ত্তি দেখিতে চাও, তাহা হইলে তুমি শ্রীরূপানুগবর এই আচার্য্যদেবে তাহার পরিপূর্ণ কলা দেখিতে পাইবে, দেখিতে পাইয়া তুমিও পূর্ণ হইতে পারিবে, তোমার অক্ষ প্রত্যক্ষ মুদ্রাগুলিও অভিধেয় অভিষিক্ত হইবে। তুমি বহির্ম্মুখতার, আপেক্ষিকতার, একদেশ-দর্শিতার বা বাহ্যদেশ-দর্শিতার কৃত্রিম চক্ষু পরিধান করিয়া অন্যরূপে দেখিতে পার—অন্যরূপ মনে করিতে পার—তোমার বহির্ম্মুখ স্বতন্ত্রতায় সেই অমঙ্গলসাধিনী স্বতন্ত্রতাটুকু আছে। কিন্তু তুমি ইহা নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া লইতে পার —আমরা সকলেই অকৃত্রিম নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ দ্বারা—তাঁহার সঙ্গ দ্বারা, আচরণ-দ্বারা, সার্ব্বকালিক ভজনমুদ্রার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি,—আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি ব্যতীত জগতের অন্যত্র কোথাও এরূপ পূর্ণতম অভিধেয়-শ্রীরূপ দর্শন করিতে পারি নাই—আর অভিধেয়-শ্রীরূপের করুণা-কলা-লহরীর এরূপ অবিরাম সম্পত্তিও আমরা আর কোথায়ও অনুভব করিতে পারি না। সেবোন্মুখ নিরপেক্ষ হইয়া আচার্য্য-অধ্যয়ন কর, তখন এই কথার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে তুমিও এই কথাকে ষোলআনা সত্য বলিয়া প্রচার করিবে।

কলির তাণ্ডবতাময় জগতে অকৃত্রিম অবিমিশ্র
অভিধেয়-মূর্ত্তি রূপে প্রভুপাদের প্রকাশ

মিশ্র-অভিধেয়—পাঁচমিশাল অভিধেয়ের কথা জগতে প্রচারিত আছে, আর আছে—মৌখিকতায়, কল্পনায়, বাক্যবাগীশতায়, শ্লোকোচ্চারণে,

বক্তৃতামঞ্চে ''*সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ*'' মুদ্রাপ্রদর্শনীতে অবাস্তব তথাকথিত আবৃত অভিধেয়ের কথা। কিন্তু অনাবৃত, অনাবিল, অবিমিশ্র, অকৃত্রিম অভিধেয়-মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্ব অঙ্গ দ্বারা—সর্ব্ব অঙ্গের শাখা-পল্লব-ফল-ফুলরূপ সুবিস্তৃতির দ্বারা সর্ব্বক্ষণ এইরূপভাবে কারুণ্য-মহাবারিধির প্লাবন আনিয়াছেন, এরূপ আচার্য্য কোন্ যুগে কে দেখিয়াছিলেন? দেখিয়াছিলেন বটে—সৌভাগ্যবন্ত, মহাপ্রভুর সময়—গোস্বামিগণের প্রকটকালে; কিন্তু বহুরূপিণী নাস্তিকতা-বিরাটরাক্ষসীর ভুবনমোহন তাণ্ডব যে-যুগকে গ্রাস করিয়াছে, সেই যুগে মহাবদান্যাবতারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রচারিত অকৃত্রিম অভিধেয়ের আনুকরণিক কৃত্রিম মুদ্রাগুলি—যাহা বস্তুতঃ অচল এবং রাজদণ্ডের অধিকারের বস্তু হইলেও সচলরূপে প্রচারিত হইতেছিল, সেই কৃত্রিমতার শত বিশ্লেষণ দেখাইয়া দিয়া কে আজ স্বীয় জীবন্ত আদর্শে সবাক্ অকৃত্রিম অভিধেয়-মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন? এ সমস্তই কহিবার কথা নয়—কহিয়া পূর্ণতৃপ্তি হয় না। ইহা অধ্যয়নের বিষয়। যিনি যতটা সেবোন্মুখতার কুমুদকে প্রফুল্ল করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, তিনি ততটা সেই প্রফুল্ল কুমুদে অভিধেয়-মূর্ত্তি আচার্য্যের পাদনখ-শোভার আসন আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত হইতে থাকিবেন।

শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—শ্রীল প্রভুপাদ

''**কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ**''—শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীরূপের অভিধেয়-শ্রীর শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ হরি-কীর্ত্তনকেই একমাত্র অভিধেয়রূপে বিস্তার করিতেছেন। 'অভিধেয়'-শব্দের অর্থ—'নাম'—'বাচ্য'। শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নাম সংকীর্ত্তনের পরম বিজয়-বিঘোষণা অভিধেয়-শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদেই জীবন্ত প্রত্যক্ষ।

(প্রবন্ধটী ''প্রভুপাদ ও অভিধেয়-নির্ণয়'' প্রসঙ্গেই সমাপ্ত। ইহার পর ''প্রভুপাদ ও প্রয়োজন-নির্ণয়'' নামে কোন প্রবন্ধ আর দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ পৃষ্ঠা ৯০-এ ''ভক্তিরাজ্যে অভিধেয়ই প্রয়োজন'' বিচার উত্থাপন-হেতু 'প্রয়োজন-নির্ণয়' প্রসঙ্গ পৃথক্‌রূপে উল্লেখিত হয় নাই।)

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

শ্রীল প্রভুপাদ উবাচ

''শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত আর যত কথা, সব আত্মার নিত্যবৃত্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবার কথা। হরি সব হরণ করিয়া থাকেন। কি হরণ করেন? চামড়া, মাংস তিনি হরণ করেন না। তিনি চান 'আমাকে'—আত্মাকে। সেই আত্মা পাঁচ প্রকার রসে তাঁহার সেবা করেন। মানুষের এই পচা চক্ষু-কর্ণাদি তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না। যদি এই চক্ষু-কর্ণাদির বিষয় তিনি হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই জগতেরই কোন ভোগ্যবস্তু-মাত্র হইয়া পড়েন। সত্ত্বোজ্জ্বলা চেতনবৃত্তিতে তাঁহার আস্বাদন হয়।

''আমি ভগবান্‌কে দেখিব''—ইহার নাম সম্ভোগবাদ বা অভক্তি, আর ''আমি ভগবান্‌কে দেখাইব,—যে-রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে'', ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে, তিনি তাহা দেখেন।''

''অধোক্ষজ-সেবক মাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা ethical। মায়াদেবী মাপিয়া লইবার বুদ্ধি বা ধর্ম্মের কথা যাহাদের মগজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, তাহারা 'কাইসার', 'নেপোলিয়ন' প্রভৃতির আদর্শকেই বড় মনে করে। কিন্তু ভক্তি আশ্রয় করিলে—ভগবানের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া যায়। ভগবান্ সুখ, দুঃখ যাহা প্রদান করেন, তাহাতেই তিনি ভগবৎসেবা করেন। ভগবানের সেবা করিলেই তদন্তর্ভুক্ত সকল বস্তুর সেবা হইয়া যায়। একজন মানবের সেবা করিলে আর এক জনের সেবা হয় না। এক দেশের মানবজাতির সেবা করিলে অন্য দেশের মানবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রদর্শন করা হয়, তাহাদিগকে নিরাশ করা হয়। মানবজাতিকে সেবা করিলে অপর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা কর হয়।''

''মায়াবাদ এই প্রদেশকে নানা প্রকারে কলুষিত করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে প্রায় ১১ কোটি লোক; ১১ জন লোক প্রকৃত সত্যকথা বুঝিলেই যথেষ্ট। ''**কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।**''

অজ্ঞরূঢ়িতে 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—নিঃশক্তিক। চিদচিৎ ভূমার নাম 'পরমাত্মা'। নির্ব্বিশেষ শক্তির পূর্ণবিকাশই 'ভগবত্তা'। 'অন্তর্য্যামী'-শব্দের অর্থ—অন্তরে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। জড় বৈজ্ঞানিকগণ 'Electron theory' ও 'Molecular theory' নামে দুইটী বিষয় বিচার করেন। তিনটী atom-এ একটী molecule; একটী atomকে ভাঙ্গিলে নয়টী electron পাওয়া যায়। Positive electron একটী ভিতরে থাকে এবং অপর আটটী বাহিরে থাকে। ভগবান্ মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, আর তৎসঙ্গে একটী Positive electron ভিতরে থাকে, আটটী (প্রোষিতভর্ত্তৃকা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি) সেই একটীর ভাবই পুষ্টি করিবার জন্য কায়ব্যূহ-রূপে বাহিরে আছে।

সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম—পরমাত্মা; নিঃশক্তিমান্ পরমাত্মা—ব্রহ্ম। যিনি রুদ্ধ নহেন, তিনিই 'অনিরুদ্ধ'। পরমাত্মা ও ভগবানের পার্থক্য এই যে, পরমাত্মায় জড়-অজড়—উভয় বিচারই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভগবত্তায় অচিদ্‌বিচারের স্থান নাই।

শ্রীভগবত্তায় ছয়টী ঐশ্বর্য্যের যুগপৎ অধিষ্ঠান। তাহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য যুগপৎ অবস্থিত। 'বৈরাগ্য'-জিনিষ—ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-সৌন্দর্য্য-জ্ঞান-হীনতা। তাহা negative assertion, আর পাঁচটা positive assertion । কিন্তু ভগবানে একাধারে যুগপৎ এই দুইটী বিষয় আছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও ঐশ্বর্য্যহীনতা যুগপৎ ভগবানেই সুন্দরভাবে সমন্বিত। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার যাঁহাতে প্রকাশিত তিনিই ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভগবত্তা প্রকাশিত।"

(গৌড়ীয় ১১শ খণ্ড, ২২শ সংখ্যা, ৩৪৩-৩৪৪ পৃষ্ঠা)

"অত্যাহারেই জীবের মৃত্যু হয়। '**জিহ্বোপস্থ-জয়ো ধৃতিঃ**"—এই শ্লোকটী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের অনুসরণীয়; কিন্তু উহা কৃত্রিমভাবে নহে, যেমন মায়াবাদী ও ফল্গুতপস্বী ব্যক্তিগণে দেখা যায়। Mollusk নামক এক প্রকার প্রাণী একবার মাত্র স্ত্রীসম্ভোগ করিতে পারে, সন্তান জন্ম দিয়াই উহা (পুরুষ-শ্রেণীর ঐ প্রাণী) মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হংসগীতার শ্লোক শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আহরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা ন কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল ন পরিবে॥"

"জিহ্বোপস্থকে জয় করার নাম 'ধৃতি'। যাঁহারা ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন, তাঁহারা কায়, মন ও বাক্য দণ্ডিত করিয়াছেন। খবরের কাগজগুলি সব গ্রাম্যবার্ত্তা। মায়ার কথার যত কাগজ-পত্র আছে, তাহা পড়িতে নাই। ঐ সকল পড়িলেই হয় তাহাদের সহিত সহযোগিতা, না হয় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য চিত্ত ধাবিত হয়।"

"মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোত্তম আশা—'ত্রিদণ্ডী' হওয়া। 'ত্রিদণ্ডী' অর্থে—অমানী, মানদ ও সহিষ্ণু হরিকীর্ত্তনকারী। বৈষ্ণবই দেবতা; কিন্তু তিনি 'দেবতা'-অভিমান, 'শর্ম্মা'-অভিমান করেন না। ত্রিদণ্ডী—"**নিরাশীর্নির্ণমস্ক্রিয়ঃ।**" ত্রিদণ্ডী কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিবেন না, নমস্কারও গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যিনি ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে "কৃষ্ণে মতিরস্তু"—এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ না করিবেন, তাঁহাকে উপবাসদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

"জাগতিক বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা প্রভৃতি সাধুত্বের লক্ষণ নহে। পিপীলিকা বলিতেছে,—'হাতী অনেক খাইয়া ফেলে, আমি অত খাই না, সামান্য খাই।' তাহা হইলে হাতী অপেক্ষা পিপীলিকাই বড় সাধু হইয়া পড়িল! কিন্তু হাতী স্যমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়, আর পিপীলিকা হয়ত' সেই কৃষ্ণকে কামড়াইয়া দেয়। হাতীটা বেশী খাইয়াও কৃষ্ণকে বহিয়া আনিল, কৃষ্ণসেবা করিল, আর পিপ্‌ড়ে কম খাইয়াও কৃষ্ণকেই হয়ত' কামড়াইয়া দিল। আমরা অনেক সময় সন্ন্যাসী (?) হইয়া ধাতুপাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম, গাছতলায় থাকিলাম; কিন্তু গাছতলায় থাকিয়া গাঁজা খাইতে শিখিলাম। এইরূপ গাঁজা-খাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী না হইয়া ঘরে থাকিলে ভাল সন্ন্যাসী হওয়া যাইত।"

"**ত্রিদণ্ডমুপজীবতি**"—ভোজন ভাল চলে বলিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভিক্ষুকের আশ্রম লইয়া যদি নিজের তহবিলে সঞ্চয় করি, তবে ত্রিদণ্ড উপজীবিকা হইয়া পড়িল।"

"শ্রীগৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষুক। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিতেছি। আমি একটা কাজের ভার নিয়াছি, কাজেই আমি নিজে একাকী সকল বাড়ীতে যাইতে পারি না। এজন্য সকলের দ্বারে দ্বারে আমার লোকদিগকে সর্ব্বদা ভিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতেছি। তোমরা কৃষ্ণের নাম-প্রচারের জন্য—জগতের যাহাতে শ্রেষ্ঠ উপকার হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু কিছু গ্রহণ কর, তাহা কৃষ্ণ-কার্য্যে নিযুক্ত হউক্। অর্থ সঞ্চয় করা, আর উহা মল-মূত্ররূপে বাহির করিয়া দিবার ন্যায় বাঁদুরে-কার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য নহে। কোটি কোটি বৈষ্ণবের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে—আমার এই কার্য্য পড়িয়া গিয়াছে।"

"অকপট হরিসেবার জন্য—শুদ্ধ হরিকথা সুষ্ঠুভাবে জগতে প্রচারের জন্য আমি প্রচারকগণকে হাজার হাজার মোটর-গাড়ী দিয়া দিতেছি, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু জড়পিণ্ড গাড়ীতে উঠিবে কেন? তাহার গাড়ীতে উঠিবার কোন অধিকার নাই। তাহা হইলে ত' সে বিষয়ী হইয়া যাইবে। যাহার মোটর-গাড়ী চড়িবার পিপাসা আছে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার পরিবর্ত্তে বাহাদুরী দেখাইবার ইচ্ছা আছে, সেইরূপ জড়পিণ্ডকে কিছুতেই বিষয়ী, ভোগী, নরকপথের যাত্রী হইবার জন্য গাড়ীতে চড়িতে দেওয়া হইবে না। তাহা হইলে তাহা তাহার উপজীবিকা হইয়া যাইবে। যিনি অকপটভাবে, কায়-মনো-বাক্যে হরিভজন করিতেছেন না, তিনি কেন গাড়ীতে চড়িবেন? আবার যদি সহজিয়া সম্প্রদায় বৃদ্ধি হয়, উহারই অন্যপ্রকার দ্বিতীয় সংস্করণ বৃদ্ধি হয়, তবে আমরা ত' মরিয়া গেলাম!"

(গৌড়ীয় ১১শ খণ্ড, ২২শ সংখ্যা, ৩৪৪-৩৪৭ পৃষ্ঠা)